মুজিব ভাই
এবিএম মূসা

মুজিব ভাই বইটি আমি এক নিঃশ্বাসে পড়েছি। মনে হয়েছে, বইটি পড়ার সময় লেখক বন্ধুবর মূসার চেয়েও বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছি বেশি। তরুণ প্রজন্মের যেসব পাঠক বঙ্গবন্ধুকে ব্যক্তিগতভাবে দেখার সুযোগ পাননি, তাঁরাও বইটি পাঠের সময় বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য অনুভব করবেন। ছোট চৌবাচ্চার পানিতে যেমন সূর্যের মতো বিরাট গ্রহের প্রতিবিম্ব ধরে রাখা যায়, তেমনি এবিএম মূসার *মুজিব ভাই* নামের ছোট বইটিতে এক মহানায়কের বিশাল চরিত্রকেও তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

ISBN 978 984 90039 6 0
9 789849 003960

একেবারে ঘরোয়া আটপৌরে ভাষায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নানা দিক এই বইয়ে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, এক কথায় যাকে বলা যায়, অতুলনীয়। একজন মানুষ যখন সাধারণ থেকে অসাধারণ বা সবিশেষ হয়ে ওঠেন, হয়ে ওঠেন ইতিহাসের মহত্তম ব্যক্তিত্ব, তখন তাঁর ঘরোয়া জীবন আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। লেখক এবিএম মূসা তাঁর টগবগে যুবা বয়স থেকে শেখ মুজিবকে দেখেছেন। কালক্রমে তাঁর 'মুজিব ভাই'য়ের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। ফলে তাঁর পক্ষে বঙ্গবন্ধুর ঘরোয়া জীবনের এমন সব দিক এই বইয়ে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে, যা এত দিন আমাদের জানার বাইরে ছিল। শুধু বঙ্গবন্ধু কেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সর্বাত্মক প্রেরণাদাত্রী সহধর্মিণী ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এবং তাঁর তিন পুত্রের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন, পাঠককে যা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। এ বই নিছক বঙ্গবন্ধুর ঘরোয়া জীবনের কথা নয়, হয়ে উঠেছে একটি নির্দিষ্ট কালপরিসরের আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেরও অমূল্য দলিল।
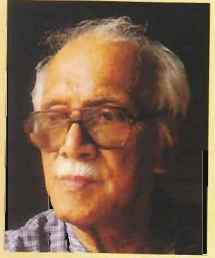
জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১, ফেনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (১৯৫০) এবং লন্ডনের কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা। বাংলাদেশ টেলিভিশন করপোরেশনের প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক। *পাকিস্তান অবজারভারের* বার্তা সম্পাদক, *মর্নিং নিউজের* সম্পাদক, *যুগান্তরের* সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান সম্পাদক। জাতিসংঘ পরিবেশন সংস্থার (ইউনেপ) ব্যাংককে আঞ্চলিক তথ্য পরিচালক। জাতীয় প্রেসক্লাব এবং সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে একাধিকবার নির্বাচিত হন। বাংলা একাডেমী, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিকেশন সেন্টারের আজীবন ফেলো। বিবিসি, লন্ডনের *সানডে টাইমস*-সহ বিদেশি গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালে রণাঙ্গন থেকে খবর পাঠাতেন। একুশে পদক ও জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট পুরস্কারে ভূষিত। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের (১৯৭৩) সদস্য। বর্তমানে বেসরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চলমান ঘটনাধারার বিশ্লেষক এবং *প্রথম আলোর* নিয়মিত কলামিস্ট।

প্রচ্ছদ : **কাইয়ুম চৌধুরী**

মুজিব ভাই

মুজিব ভাই
এবিএম মূসা

প্রথমা
প্রকাশন

মুজিব ভাই
গ্রন্থস্বত্ব © প্রথম আলো ট্রাস্ট
চতুর্থ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪২০, জুলাই ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৯, আগস্ট ২০১২
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ১৮০ টাকা

Mujib Bhai
by ABM Musa
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180078-81
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 180 only

ISBN 978 984 90039 6 0

উৎসর্গ

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে
বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আরও যাঁরা
শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদের প্রতি

সূচিপত্র

ভূমিকা

বই লেখা সহজ, বইয়ের ভূমিকা লেখা তত সহজ নয়। কোনো বইয়ের ভূমিকা লেখা অনেকটা সমুদ্রে সাঁতার কাটার মতো। কোন দিকে সাঁতার কাটলে সহজে তীরে পৌঁছাব, তা যেমন জানা থাকে না, তেমনি কোনো বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসলেও তার কোন দিক নিয়ে লিখলে বইটির গোটা পরিচয় তুলে ধরা যাবে, তা বোঝা কষ্টকর। বন্ধুবর এবিএম মূসার *মুজিব ভাই* বইটি আকারে খুব বড় নয়, কিন্তু প্রকারে বড়। অর্থাৎ সমগ্র মুজিবকে বুঝতে হলে এই ছোট বইটি যত সাহায্য জোগাবে, অনেক মহাভারতসদৃশ বড় বইও তা পারবে না।

বইটির নামকরণই এর সবচেয়ে বড় ভূমিকা। মূসা কেন এ বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্য আমার মতো দূরদ্বীপবাসী অভাজনকে বেছে নিলেন, তা আমি জানি না। সে কি বন্ধুপ্রীতির জন্য? নাকি আমরা দুজনেই বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হিসেবে গণস্বীকৃতি পাওয়ার পরও তাঁকে মুজিব ভাই ডাকতাম, এই সুবাদে? বঙ্গবন্ধুকে শেষ জীবনে প্রায় সকলেই বঙ্গবন্ধু নামে সম্বোধন করতেন। একেবারে অন্তরঙ্গ দু-একজন ডাকতেন লিডার।

বঙ্গবন্ধু নিজেও একবার ('৭০-এর নির্বাচনের আগে) রমনার রেসকোর্সের এক উত্তাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের নেতা নই। আপনাদের নেতা শেরেবাংলা ফজলুল হক, আপনাদের নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তাঁরা এখন কবরে শুয়ে আপনাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি আপনাদের মুজিব ভাই। আপনাদের সংগ্রামের সাথি।'

তবু, ভাই থেকে তিনি জাতির পিতৃত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন নিজের

কর্মগুণে, সাহস ও সংগ্রামের গুণে। যে গুণের জন্য মোস্তফা কামাল পাশাকে নব্য তুরস্কের মানুষ নাম দিয়েছিল আতাতুর্ক বা তুরস্কের পিতা। শেখ মুজিবুর রহমান নামের এক নেতাকেও বাংলার মানুষ ভালোবেসে প্রথম বন্ধু (বঙ্গবন্ধু) ডেকেছে, তারপর জীবন বাজি রেখে যে বন্ধু তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির বার্তা ঘোষণা করেছেন, তাঁকে স্বেচ্ছায় সানন্দে পিতৃত্বে বরণ করে নিয়েছে। তিনি হয়েছেন জাতির পিতা। গঠন করেছেন একটি স্বাধীন দেশ ও স্বাধীন জাতি।

এতৎসত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু তাঁর 'মুজিব ভাই' সম্বোধনটি খুব ভালোবাসতেন। কেউ ভুলেও তাকে মুজিব ভাই ডেকে ফেললে দেখতাম, তার চোখেমুখে আনন্দের প্রতিভাস। মনে হতো, তিনি যেন আপন সত্তায় ফিরে গেছেন। আমার এক দিনের ঘটনা মনে আছে। বঙ্গবন্ধু তখন রাষ্ট্রপতি। ছোটবড় সকলেই তাঁকে বঙ্গবন্ধু নামে সম্বোধন করেন। একদিন দ্বিতীয় গণভবনে তাজউদ্দীন আহমদ এসেছেন। আমিও তখন বঙ্গবন্ধুর কাছে বসা। তাজউদ্দীন আহমদকে বঙ্গবন্ধুই ডেকেছিলেন কী একটা জরুরি ব্যাপারে আলোচনার জন্য। তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে লিডার সম্বোধন করতে দেখেছি। আগে হয়তো ডাকতেন মুজিব ভাই। সেদিন কথায় কথায় হঠাৎ বঙ্গবন্ধুকে সম্বোধন করেছিলেন মুজিব ভাই।

বঙ্গবন্ধু সেই সম্বোধন শুনে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদকে সহসা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন, আবার একবার মুজিব ভাই বলে ডাকো। কত দিন এই ডাকটা শুনি না। বঙ্গবন্ধু, লিডার—এসব ডাক শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তোমার মুখে মুজিব ভাই ডাকটা শুনে মনে হলো, আমি যেন ছয় দফার সেই সংগ্রামী দিনগুলোতে ফিরে গেছি। আমি আবার তোমাদের পুরোনো দিনের সেই মুজিব ভাই।'

বঙ্গবন্ধু হওয়ার আগে এই নেতাকে সারা বাংলার মানুষ জানত মাত্র একটি নামে, 'শেখ সাহেব'। এখনো শেখ সাহেব বললে বাংলার হাজার হাজার শেখের কাউকে বোঝায় না, বোঝায় একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাংলার সাধারণ মানুষ কোনো নেতাকে ভালোবাসলে তার নামের আগে বিশেষণের পর বিশেষণ বসায় না। বরং তার নামটি ছোট্ট করে ফেলে। যেমন শেরেবাংলা ফজলুল হককে তারা বলত 'হক সাহেব'।

হক সাহেব বললে বাংলাদেশে এখনো আর কোনো হক সাহেবকে বোঝায় না, বোঝায় একমাত্র ফজলুল হক সাহেবকে।

বিস্ময়ের কথা, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকেও দেশের শিক্ষিত জনেরা জননেত্রী, দেশরত্ন, ভাষাকন্যা ইত্যাদি নানা খেতাবে ভূষিত করেছেন। কিন্তু বিশাল গ্রামবাংলার সাধারণ চাষি-মজুর মানুষের কাছে শেখ হাসিনার পরিচয় শেখের বেটি। এই শেখের বেটি বললে বাংলাদেশের আর কোনো শেখের কন্যাকে বোঝায় না, বোঝায় একমাত্র শেখ হাসিনাকে। শেখ সাহেব বা মুজিব ভাই বললেও যে হিমালয়সদৃশ মানুষটির সামগ্রিক পরিচয় ফুটে ওঠে, বঙ্গবন্ধু বা জাতির জনক বলার মধ্যে সেই সমগ্র পরিচয়টি ফুটে ওঠে না। শেষের নামগুলো পদবি, পরিচয় নয়।

গ্রন্থকার মূসার দূরদর্শিতা এখানেই যে, একটি ছোট স্মৃতিচারণামূলক বইয়ে তিনি সমগ্র মুজিবকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং তাতে সফল হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এখন বাজারে ছোট-বড় অনেক বই। কিন্তু এমন অন্তরঙ্গ আলোকে নেতা, ভাই, বন্ধু এবং পিতা হিসেবে মুজিব-চরিত্রের চিত্রায়ণ কমই চোখে পড়েছে। বইটির পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, আমার চিরচেনা মুজিব ভাই চোখের সামনে বসে আছেন। আমরা সাংবাদিক তিন বন্ধু—ফয়েজ আহমদ, এবিএম মূসা এবং আমি। বঙ্গবন্ধু আমাদের নাম দিয়েছিলেন, আপদ, বিপদ ও মুসিবত। ফয়েজ ছিল আপদ, মূসা বিপদ এবং আমি মুসিবত। মূসা তাঁর বইতে এ কথাটি উল্লেখ করেছেন। আমরা বঙ্গবন্ধুকে ডাকতাম মুজিব ভাই, তিনি বঙ্গবন্ধু হওয়ার পরেও।

একটি ছোট্ট গল্প বলি। বঙ্গবন্ধু তখন স্বাধীন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, জাতির জনক। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান তখনো বেঁচে ছিলেন। সাংবাদিকেরা তাঁকে একবার কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি এখন জাতির জনকের পিতা। কেমন বোধ করছেন?' তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'সে তোমাদের কাছে জাতির জনক। কিন্তু আমার কাছে সে এখনো ছোট্ট খোকা। যাকে আমি চিরকাল খোকা বলে ডেকেছি।' গ্রন্থকার মূসা ঠিকই ধরেছেন, যে মানুষটি আজ বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক ইত্যাদি নামে বিশ্বনন্দিত বিশাল ব্যক্তিত্বে পরিণত, তিনি আমাদের মতো কিছু মানুষের কাছে এখনো মুজিব ভাই আছেন। এই নামটির মধ্যে আমরা

এমন একজন মানুষকে খুঁজে পাই, যিনি মহামানব (great man) হয়েও অতি কাছের মানুষ।

মূসার *মুজিব ভাই* বইটিতে এই কাছের মানুষটিকেই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বইয়ে এমন সব অজানা কথা আছে, যা এই বিরাট মাপের মানুষটির ঘরোয়া চরিত্রের পাশাপাশি তাঁর মহত্ত্ব, বিরাট হৃদয়, অসাধারণ মানবিক গুণগুলো তুলে ধরেছে। মুজিব-চরিত্র বহুমাত্রিক। পুত্র, পিতা, স্বামী, বন্ধু হিসেবে তাঁর চরিত্রের যে বিশেষত্ব; নেতা, রাজনীতিক, সংগ্রামী, সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও অনুরূপ বিশেষত্বগুলো রয়েছে। গ্রন্থকার মূসা ছোট ছোট স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে তা আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাষা অন্তরঙ্গ, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী।

মুজিব ভাই বইটি কোনো গবেষণাগ্রন্থ নয়। বইটি পড়তে গিয়ে এখানেই স্বস্তি পেয়েছি। এক মনীষী বলেছেন, 'গবেষকের দেখার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকে। চোখের দেখার মধ্যে থাকে বিভ্রম। এই বিভ্রমটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে চোখের দেখার কোনো তুলনা নেই।' বন্ধুবর মূসা এই মনীষী-বাক্যটি সঠিক প্রমাণ করেছেন। তিনি বই-পুস্তক ঘেঁটে, গবেষণার দ্বারা নয়, চোখের দেখার আলোকে যে বিরাট মানুষটির ছবি ক্লোজআপে ধরে রেখেছেন, সেই ছবি ধরে রাখার কাজে চোখের দেখার বিভ্রমটুকু তিনি এড়াতে পেরেছেন।

বইটি বিভিন্ন সময়ের লেখা স্মৃতিকথার সংকলন, কিন্তু বিষয়ের পারম্পর্য রক্ষা পাওয়ায় মনে হয় একটি ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমিক লেখা। বইটি পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় না এবং যাঁর সম্পর্কে এই স্মৃতিকথা, তাঁকে সঠিকভাবে চিনতেও কষ্ট হয় না। বইটির পাণ্ডুলিপিতে ১১টি অধ্যায় রয়েছে: 'অন্তরঙ্গ আলোকে কিছু স্মৃতি', 'রঙ্গরসে বঙ্গবন্ধু', 'প্রেরণাদায়িনী ফজিলাতুন্নেসা মুজিব', 'স্মৃতিতে কামাল-জামাল-রাসেল', 'সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা', 'মওলানা ও তাঁর মজিবর', 'বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা এবং একটি সংশ্লিষ্ট কাহিনি', 'শেখ মুজিবের বিশাল হৃদয়খানি', 'অকুতোভয় পিতা, নিবেদিতপ্রাণ পুত্র', 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ', 'বঙ্গবন্ধু হত্যা অ্যান্ড দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার'।

প্রত্যেকটি অধ্যায় সুলিখিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। আগেই বলেছি, বইটিতে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখা মানুষ মুজিব আছেন। আছে তাঁর রঙ্গরসপ্রিয়তা।

তাঁর রাজনৈতিক নেতা হয়ে ওঠার পেছনে পত্নী ফজিলাতুন্নেসা ওরফে রেনুর সর্বত্যাগী, সাহসী ভূমিকার কথা। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের সম্পর্কের অনেক অজানা তথ্য বইটিতে আছে। শেখ কামালের ব্যাংক ডাকাতির কথা যে উদ্দেশ্যমূলক বানোয়াট প্রচার ছিল, দক্ষ সাংবাদিকতার মতো তিনি তা সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঘোষণাতে তিনি নিজের ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। বলেছেন, এটা যুদ্ধ ঘোষণা এবং স্বাধীনতা রক্ষার ডাক।

বঙ্গবন্ধু যে কী বিশাল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, বইটিতে তার প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলায় ফিরে আসার পর নিজের পরম রাজনৈতিক শত্রুদেরও ক্ষমা করে তিনি তাদের ব্যক্তিগতভাবেও গোপন সাহায্য দিয়েছেন, তার একাধিক ঘটনা মূসা উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী ঘটনা বাংলাদেশ ও বাঙালির সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য কুখ্যাত *মর্নিং নিউজ* (অধুনালুপ্ত) পত্রিকার অবাঙালি সম্পাদক বদরুদ্দিনের প্রাণরক্ষা এবং তাঁকে ঢাকার আসাদগেটের বাড়ি বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রায় তার পুরো দামসহ পাকিস্তানে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এই বদরুদ্দিন দিনের পর দিন শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে লিখতেন, তাঁর চরিত্র হনন করতেন। এই ধরনের মহানুভবতার ঘটনা আমারও অনেক জানা আছে।

মুজিব ভাই বইটিতে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' শীর্ষক অধ্যায়টি। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ফিরে না এলে দেশটির স্বাধীনতাই যে অর্থহীন হয়ে যেত এবং রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে দেশটির পরিণতি কী দাঁড়াত, মিত্র ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে যেত কি না, হাজার হাজার কোলাবরেটর ও তাদের নেতাদের (যারা এখন বঙ্গবন্ধুর নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর) জীবন রক্ষা যে দুরূহ হতো, এ-সম্পর্কিত প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ সামনে টেনে এনে একজন সৎ ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যায় দেশি-বিদেশি প্রতিবিপ্লবীদের, বিশেষ করে মার্কিন সিআইএ ও হেনরি কিসিঞ্জারের সংশ্লিষ্টতা তিনি *ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার* বইটির তথ্য এবং নিজের অনেক তথ্য ও যুক্তিসহ তুলে ধরেছেন। বইটিতে ছোটখাটো কিছু ভুল, ঠিক ভুল নয়, স্মৃতিবিভ্রাট আছে।

যেমন, এক স্থানে তিনি জেনারেল ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সর্বাধিনায়ক লিখেছেন। জেনারেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন না, ছিলেন প্রধান সেনাপতি। বইয়ের আরেক স্থানে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু যে সর্বাধিনায়ক ছিলেন, সে কথাও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাঁর আগের উল্লেখটি স্লিপ অব পেন মনে হয়।

আরেক স্থানে 'মওলানা ভাসানী তাঁর কিছু অনুসারীসহ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন' কথাটিও সর্বাংশে সঠিক নয়। সাতচল্লিশের বাংলা ভাগের পর মুসলিম লীগের আবুল হাশিম ও সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপের নেতা-কর্মীরা (তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন) ঢাকায় এসে পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠনের উদ্যোগ নেন। আবুল হাশিম তখনো কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেননি। সোহ্‌রাওয়ার্দীপন্থী নেতাদের মধ্যে মোহাম্মদ আলী বগুড়া, টি আলী, এম এ মালেক মন্ত্রিত্বের অফার পেয়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন নাজিম উদ্দিন গ্রুপে চলে যান। মওলানা ভাসানী তখন সদ্য আসাম থেকে এসেছেন। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা ও অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর তীব্র মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করে নতুন বিরোধী দল গঠনে নেতৃত্ব দিতে রাজি হন। আওয়ামী মুসলিম লীগ নামটি তাঁরই দেওয়া।

মুজিব ভাই বইটি আমি এক নিঃশ্বাসে পড়েছি। মনে হয়েছে, বইটি পড়ার সময় লেখক বন্ধুবর মূসার চেয়েও বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছি বেশি। তরুণ প্রজন্মের যেসব পাঠক বঙ্গবন্ধুকে ব্যক্তিগতভাবে দেখার সুযোগ পাননি, তাঁরাও বইটি পাঠের সময় বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য অনুভব করবেন। ছোট চৌবাচ্চার পানিতে যেমন সূর্যের মতো বিরাট গ্রহের প্রতিবিম্ব ধরে রাখা যায়, তেমনি এবিএম মূসার *মুজিব ভাই* নামের ছোট বইটিতে এক মহানায়কের বিশাল চরিত্রকেও তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
লন্ডন, ১ আগস্ট ২০১২

আমার কথা

কোনো জীবনী নয়, রাজনৈতিক জীবনের সফলতা ও বিফলতার মূল্যায়ন নয়, কিংবা ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনাও নয়। পুস্তক বা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত আমার এই ছোট্ট বইকে কতিপয় প্রবন্ধের সংকলন বলা যেতে পারে। এগুলো প্রায় দুই দশকে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকীতে প্রকাশিত কতিপয় কলাম, প্রবন্ধ বা নিবন্ধের সংকলন। যেগুলো জোগাড় করতে পারিনি সেগুলো পরে সংকলিত করার ইচ্ছে আছে। বর্তমান সংকলনে আলোচিত হয়েছে একজন তরুণ, পরবর্তী সময়ে শ্রদ্ধেয় জননেতা ও সবশেষে একটি জাতির পিতা নতুন রাষ্ট্রের জন্মদাতা এবং পরবর্তী সময়ে সেই দেশের বা রাষ্ট্রের পরিচালকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচ্ছিন্ন বিবরণ।

আজ থেকে সাড়ে পাঁচ যুগ আগে একজন তরুণ ছাত্রনেতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, যাঁর চরিত্রের অগ্নিচ্ছটার মধ্যে পেয়েছিলাম বিচিত্র সব গুণ, যা এই পুস্তক বা পুস্তিকায় কয়েকটি অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। অতি তরুণ বয়সে, প্রকৃতপক্ষে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ কালে তিনি ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে আসীন হয়েছিলেন। জাতীয় নেতৃত্বের প্রথম ধাপে যখন পদার্পণ করেন, তখন তিনি তুখোড় দৃঢ়চেতা আদর্শবাদী কলেজছাত্র। আমার কৈশোরের শেষ প্রান্ত ও সাংবাদিকতা-জীবনের পূর্ণ যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের প্রথম স্তর কেটেছে নানা পরিস্থিতিতে; রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক বিভিন্ন আঙিনায়। সেসব সময়েই তাঁর অতি কাছে এসেছি, তাঁর একান্ত, অন্তরঙ্গ, নিবিড় সান্নিধ্যও পেয়েছি।

রাজনৈতিক অঙ্গনে আর নিভৃতে আন্তরিক পরিবেশে আমি একা ছিলাম না, আরও ছিলেন সাংবাদিকতা জগতে সদ্য পদার্পণকারী অনেক তরুণ। প্রবন্ধগুলোতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁদের উল্লেখ রয়েছে।

মনে হয়, উপরিউক্ত দীর্ঘ বক্তব্যের পর প্রকৃত নামটি বলতে হবে না। বিভিন্ন জনের কাছে তিনি অসংখ্য সব পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন। তিনি সর্বস্তরের—সামান্য কয়েকজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত—বিশ্বের সব বাঙালির বঙ্গবন্ধু। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান, জনগণের অবিসংবাদী নেতা, সাহসী এক সিংহপুরুষ। মাঠেঘাটে-জনতার অঙ্গনে 'শ্যাখ সাহেব', 'শ্যাখের পোলা'। আমাদের কয়েকজনের ছিলেন 'মুজিব ভাই', শুধুই একান্ত আপনজন। সব সময়, সব পরিস্থিতিতে তিনি আমাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি পরিচয়ে পরিচিত হতে পারেননি অথবা শুধু রাজনৈতিক পরিচয়ে তাঁকে দেখা হয়নি। ছিলেন অগ্রজ, ভালোবাসার আপনজন। এই কারণেই এই প্রবন্ধ-সংকলনটির নাম দিয়েছি *মুজিব ভাই*।

প্রবন্ধগুলো আদিতে কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে পঁচাত্তর-পরবর্তী বিভিন্ন পত্রিকায় 'কলাম' আকারে ছাপা হয়েছে। এই ছাপানো পর্বের পটভূমি বিচিত্র বটে। ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশের তাগাদাও বিচিত্রতর। সেই পটভূমির বর্ণনা হয়তো আগেও বিভিন্নভাবে ভিন্ন পরিস্থিতিতে দিয়েছি। পুনরুল্লেখ পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক ঘটাতে পারে, তবু না বললেই নয়; কারণ, এর সঙ্গে আমার নিজের ছয় দশকের সাংবাদিক-জীবনের এক বাঁক থেকে অন্য বাঁকে মোড় নেওয়ার ও পথচলার বিবরণটি জড়িত রয়েছে।

মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে, তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে, ১৯৪৮ সালে প্রথম পরিচয়ের আকস্মিকতা একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর গত আড়াই দশকে প্রায় প্রতিবছর তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা ও প্রিয় সান্নিধ্য নিয়ে লিখেছি বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকীতে। আমার কলম-লেখালেখিতে প্রথম ইন্ধন জুগিয়েছেন সাংবাদিক-সম্পাদক মতিউর রহমান। সেই লেখালেখির প্রারম্ভিকতার প্রথম বৈচিত্র্য হচ্ছে দীর্ঘকাল ইংরেজি সাংবাদিকতা করে আকস্মিকভাবে বাংলা পত্রিকার জগতে পদচারণ। ১৯৯৫ সালে দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর

কোনো এক সংখ্যায় প্রথিতযশা কলামিস্ট বন্ধু আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বোধ হয় বিএনপির অপশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে থাকা জামায়াতের মিলিত আন্দোলনের সমালোচনা বা নিন্দা করেছিলেন। একদিন আমি তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে মতির সঙ্গে তর্কে মেতে উঠলাম। তখনকার *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদক বললেন, 'যা বলেছেন, তা লিখুন না কেন?' আমি বলি, 'সর্বনাশ, তুখোড় কলামিস্ট, হোক না অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁর বক্তব্যের পাল্টা যুক্তি দেব আমি? তা-ও বাংলায়, একজন ৪০ বছর ইংরাজি সাংবাদিকতা রপ্ত করা সাংবাদিক?' তবু লিখলাম, ছাপা হলো। গাফ্ফার জবাব দিলেন, তারপর পাল্টা জবাব। সে-ই শুরু। তারপর *জনকণ্ঠ*, *যুগান্তর*, *সমকাল*, মতিউর রহমানের নতুন পত্রিকা *প্রথম আলো* ও ছোট-মাঝারি পত্রপত্রিকা এবং সাময়িকীতে আরও 'কলাম' ছাপা হতে লাগল। অনেক লেখা পাঠকসমাজে নন্দিত ও নিন্দিত হলো।

মতিউর রহমানের প্ররোচনা বা উসকানিতে এভাবেই আমার বাংলা পত্রিকায় কলাম লেখার শুরু। এসব কলামের বিভিন্ন শিরোনামেও ছিল ভিন্নতা। সর্বশেষ *প্রথম আলোর* 'সময়ের প্রতিবিম্ব'। এসব তাৎক্ষণিক লেখা প্রবন্ধ আমার মনে হয়েছে শুধু নির্দিষ্ট 'সময়োপযোগী'। পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর এসবের পরবর্তী সমসাময়িক কালের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকে না। তাই সেসব সংগ্রহে রাখার প্রয়োজন অনুভব করিনি। এমনকি ছাপা হওয়ার পর অনেক পাঠকের প্রশংসনীয় প্রতিক্রিয়ার পরও নিজে দ্বিতীয়বার পড়ে দেখিনি। তা ছাড়া *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক স্নেহভাজন আব্দুল কাইয়ুম ও এ কে এম জাকারিয়া ছাপার আগে সংশোধন বা সংযোজনের কাজটি করেছে। তাই ছাপার আগে দ্বিতীয়বার দেখার প্রয়োজন হয়নি।

ইতিমধ্যে সেই লেখালেখিতে, গত পাঁচ-ছয় মাস শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছেদ পড়েছে। বয়সের ভারে ও নানা ব্যাধিতে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। পরম হিতৈষী ল্যাবএইডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার এ এম শামীম, হৃদ্‌যন্ত্র-সংস্কারক সাহিত্যিক-ডাক্তার বরেন চক্রবর্তী, ফুসফুসের অবস্থানের আদি-অন্ত জ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপক আলী হোসেন আর মূত্রাশয়ের চিকিৎসার অসামান্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক

জাহাঙ্গীর কবির নির্দেশ দিলেন, 'এবার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। নো লেখালেখি, নো টেলিভিশন টক-শো।'

এই অজুহাতে লেখালেখির শত অনুরোধ উপেক্ষা করে আরামেই কাটছিল দিন। সেই বিশ্রামে আবার বাদ সাধলেন একই ব্যক্তি, *প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রহমান তথা প্রথমা প্রকাশনের মতিউর রহমান। বললেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যা কিছু লিখেছেন তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করব। পেছনে ফেউ লাগিয়ে দিলেন প্রথমা প্রকাশনের নিরলস কর্মী জাফর আহমদ রাশেদকে। মতি বলে তো খালাস, কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, 'সময়ের প্রতিবিম্ব' সময়ের সঙ্গে মুছে গেছে। এখন সেগুলোর ছায়া বা কায়া দেখব কোথায়? সেসব খোঁজাখুঁজির দায়িত্ব নিলেন অনুজ সাংবাদিক কানাই চক্রবর্তী, আমার সব সময়ের সেবক-সাথি সাইদুজ্জামান শাহীনকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে নামল। বিভিন্ন পত্রিকা ভবনে, জাতীয় আর্কাইভে আর নানাজনের বঙ্গবন্ধু-সম্পর্কীয় বই-পুস্তক ঘেঁটে প্রধানত কানাই পুরোনো সব পত্রিকা থেকে এবং কতিপয় সত্যিকার লেখকভক্ত পাঠকের কাছ থেকে সব না হলেও অনেকগুলো লেখা জোগাড় করল। সেগুলো ক্রমানুসারে গোছানোর দায়িত্ব সুসম্পন্ন করল সাংবাদিকতার পিতৃপেশা-অনুসারী আমার স্নেহময়ী কন্যা পারভীন সুলতানা ঝুমা। প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠানোর আগে আমার সাংবাদিক স্ত্রী সেতারা মূসা সেগুলোয় চোখ বুলিয়ে শত সাংসারিক কাজের মধ্যে 'ঝালিয়ে' দিয়েছেন; এবার পুস্তকাকারে প্রকাশে মতির প্রস্তাবে ইন্ধন জুগিয়েছেন। তাঁকে কি ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন আছে?

কোনো কোনো বইতে নাকি কিছু ছবি ছাপতে হয়, তাই সেসব খোঁজাখুঁজি করার কাজে লিপ্ত হলো আরেক অনুজ-সেবক মার্টিন কে পি দাশ আর শাহীন। প্রবন্ধগুলো বিগত বছরগুলোতে কম্পিউটার কম্পোজ করে পত্রিকায় পাঠিয়েছে আহসানউল্লাহ। আমার অপাঠ্য হস্তাক্ষরের পাঠোদ্ধারের কৃতিত্বের জন্য তার প্রশংসা করতেই হয়। সবশেষে বহু দিনের পুরোনো বন্ধু কাইয়ুম চৌধুরীকে অনবদ্য প্রচ্ছদটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এত সব নিয়ে বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির প্রাথমিক পর্ব পার হলাম।

এরপর ল্যাঠা লাগল, বইয়ের নাকি একটি ভূমিকা থাকতে হবে। মুশকিল হলো, আমি যা-কিছু লিখেছি, তার সবই যে শতকরা ৯৯ ভাগ সত্যি, তা বলবে কে? বিশেষ করে, কিছু ইতিহাসভিত্তিক বর্ণনা বা ঘটনার উল্লেখ যে আছে! আমার সময়ের প্রায় সবাই তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমার বড় সৌভাগ্য, একজন অন্তত আছেন, তবে দূরদেশে। সেই কৈশোর থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে আমি যেভাবে দেখেছি, একই দৃষ্টিতে অতি কাছে থেকে তিনিও তাঁকে দেখেছেন। তিনি সানন্দে রাজি হলেন ভূমিকা বা উপক্রমণিকাটি লিখতে; এবং লিখলেনও। তিনি আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী—সাড়ে ছয় দশকের অকৃত্রিম বন্ধু, পাঠকপ্রিয় কলামিস্ট। তাঁর লিখিত ভূমিকায় যা লেখা হয়েছে আর আমার স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত কিছু আবছা কাহিনির বিবরণ, দুটোতে হয়তো কোথাও সামান্য গরমিল থাকতে পারে। দুটোই হুবহু ছেপেছি।

গাফ্‌ফারকে কৃতজ্ঞতা জানানো নিরর্থক; কারণ, তিনি লিখবেন না তো কে লিখবেন! রাশেদের মতে, তাঁর লেখা ভূমিকা নাকি আমার লেখাগুলোর চেয়েও চমকপ্রদ হয়েছে। তা-ই তো হওয়া স্বাভাবিক, ঝানু কলামিস্ট আর বাই চান্স, হঠাৎ প্রাবন্ধিক বনে যাওয়া কলাম লেখকের লেখালেখির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত থাকবেই। তা ছাড়া আমি নিজেও লেখালেখিতে তাঁকে অনুকরণ বা অনুসরণ করে থাকি। এখনো দুজনেই বিস্মৃত ঘটনাবলি পরস্পরের কাছ থেকে ঝালাই করে নিই।

আমার কথা অনেক হলো। আরও কিছু বলার হলে পরবর্তীকালে সময়-সুযোগ ও অবস্থার বিবেচনায় বলা যাবে। শুধু পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করব, কোনো পুস্তক প্রকাশনা জগতে এ আমার 'পয়লা কদম'। তার পরও দুটি কথা থাকে। এক, ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর একটি *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রকাশিত হয়েছে। পঁচাত্তরের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু দুপুরে বিশ্রামের সময়ে গাফ্‌ফারকে তাঁর আত্মজীবনী শ্রুতিলিখনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে লিখতেন। মাঝেমধ্যে তাঁর প্রেস সচিব তোয়াব খান আর আমি দূরে বসে শুনতাম। কিছুদিন পর তিনি স্ত্রীর চিকিৎসার্থে বিলেত চলে গেলে লেখায় ছেদ পড়ে। কয়েক দিন আগে গাফ্‌ফারকে টেলিফোনে প্রশ্ন করলাম, 'সেই

লেখার পাণ্ডুলিপি কোথায়?' গাফ্‌ফার গম্ভীর গলায় জানালেন, 'শ্রুতিলিখনে যা আছে, তা যে সব ছাপতে পারব না।' প্রশ্ন করলাম, 'কেন? কোনো গরমিল আছে কি?' গাফ্‌ফার কোনো উত্তর দিলেন না। তবে আমরা দুজনে বলাবলি করেছি, প্রকাশিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* যেখানে শেষ হয়েছে, আমরা সেখান থেকে জনান্তিকে একটি সম্পূর্ণ জীবনী লেখা শুরু করব কি না। হয়তো শুরু করতে পারব, শেষ করতে পারব না। কারণ, দিনে দিনে আমাদের বেলা যে পড়ে এল।

এবিএম মূসা
ঢাকা, ২ আগস্ট ২০১২

অন্তরঙ্গ আলোকে কিছু স্মৃতি

হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকিয়ে সর্বোচ্চ পর্বতমালার উচ্চতা মাপা যায় না। মাত্র দেড় শতাব্দী আগে একজন বাঙালি ভূ-জরিপকারী পর্বতশৃঙ্গটির উচ্চতা নির্ধারণ করেন ন্যূনাধিক ২৯ হাজার ফুট। পর্বতমালার পাদদেশে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে নয়, হিলারি-তেনজিংয়ের মতো পর্বত অভিযানে চূড়ায় উঠেও নয়, শত মাইল দূরে বিহারের কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে তিনি এই উচ্চতা নির্ধারণ করেন। তবে গজ-ফিতা দিয়ে হিমালয়-সদৃশ শেখ মুজিবুর রহমানের শারীরিক উচ্চতা অনুমান করা গেলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা অথবা হৃদয়ের বিশাল ব্যাপ্তি কোনো মানদণ্ড দিয়ে মাপা অথবা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা সম্ভব ছিল না। শুধু কাছে-দূরে থেকে তাঁর জীবনকালের কীর্তি ও অর্জন, রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর সফলতা-বিফলতা, স্বল্পকালীন রাষ্ট্র পরিচালনাকালে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা অথবা দুর্বলতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যেত, এখনো করা যায় কিংবা করা যায় না। কারণ, সমসাময়িক ইতিহাসে সব তথ্য থাকে না, সব সত্য বলা যায় না। আমাদের অনেকের, যাদের তাঁর পাদদেশে যাওয়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে, আমরা তাঁর কীর্তি ও কর্মধারার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করিনি এবং এখনো করি না। আমাদের আছে শুধু তাঁকে কাছে পাওয়ার, তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে যাওয়ার মধুর অনেক স্মৃতি।

প্রথম আলোয়, ইতিপূর্বে *জনকণ্ঠ* পত্রিকায় কলাম লেখার তাগিদে

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে, রাজনীতির প্রবাদপুরুষ, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অতি সন্নিকট থেকে দেখার সামান্য স্মৃতি রোমন্থন করেছি। তাঁর ব্যক্তিত্বের আলোকচ্ছটার একটুখানি ঝলক এবং অন্তরঙ্গ আলোকে তাঁকে দেখার দু-চারটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করব। আমি চব্বিশ বছরের সান্নিধ্যকালে বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি, একচোখা দৃষ্টিতে মুজিব ভাইকে দেখেছি। বঙ্গবন্ধু বলতাম না, তাই আমাকে দেখলেই বলতেন, বঙ্গবন্ধু সবার বন্ধু, তোমার বন্ধু নয়। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, ফয়েজ আহ্‌মদ ও আমি ছিলাম সাংবাদিকদের মধ্যে তাঁর অতিপ্রিয় তিনজন। একসঙ্গে দেখলেই বলতেন, এই রে সারছে! আপদ, বিপদ আর মুসিবত একসঙ্গে। কী জানি কী ফ্যাসাদে ফেলবে!

ফ্যাসাদে তাঁকে ফেলেছি বহুবার, শুধু দুটির কথা বলব। সে দুটি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও বঙ্গবন্ধুর একটি ভিন্ন পরিচয় তুলে ধরবে। তরুণ শেখ মুজিবের সঙ্গে একান্ত পরিচয় হয়েছে একেবারে চোখের দেখায় চল্লিশের দশকের শেষে তাঁর আয়োজিত একটি যুব সম্মেলনে। পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়ে সাংবাদিকের পেশাগত কর্তব্য পালনের সুবাদে অথবা অবসর মুহূর্তের পরম সান্নিধ্যের সুযোগে, যাকে প্রচলিত বাংলায় বলা হয় 'আড্ডা', তাতে তাঁকে অন্তরঙ্গ পরিবেশে কাছে পেয়েছি। ব্যক্তি মুজিব স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ও অনেককে রাজনীতিতে এতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন যে কীর্তিমান ইতিহাসের মহাপুরুষ অথবা প্রশাসক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে অন্য কোনো মানদণ্ডে যাচাই করে দেখিনি। দেখলেও গুরুত্ব দিইনি। মজার ব্যাপার হলো, এত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও আবদার আর অনুযোগ করে তাঁর কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ অথবা অনুকম্পা পাইনি। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে অনুযোগগুলোর (তাঁর ভাষায় 'মুসিবত') কয়েকটির উদাহরণ দেব।

পাকিস্তান থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই মুজিব ভাই ৩২ নম্বরের বাড়িতে সরাসরি যাননি। পঁচিশের কালরাত্রিতে বাড়িটি পাকিস্তানি সেনাদের গুলি আর মর্টারের গোলায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। প্রকৌশলী মাঈনুল ইসলাম ও ইসলাম ব্রাদার্স নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের জহুরুল ইসলাম এটি সংস্কার করতে কয়েক দিন সময় নিয়েছিলেন। যা-ই হোক,

প্রত্যাবর্তনের পরদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আমাকে ধানমন্ডির অস্থায়ী বাসভবনে ডেকে পাঠান। তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম মহাপরিচালকের পদে নিয়োগ দেন। আমি বিব্রত বোধ করে বললাম, 'নেতা, আমি সংবাদপত্রের লোক, টেলিভিশন বুঝি না।' বঙ্গবন্ধু রেগে বললেন, 'আমাকে বুঝিস তো?' উত্তর দিলাম, 'সবটা না হলেও বোধ হয় অনেকখানি বুঝি।' তিনি বললেন, 'যা, তাতেই হবে।' বহু বছর পর ভেবেছি, সত্যিই বঙ্গবন্ধুকে যারা বুঝেছিল, শুধু তারাই বাঙালিকে চিনেছিল, বাংলাদেশকে ভালোবাসতে পেরেছিল। এবং এখনো ভালোবাসে তাঁর স্মৃতি ও অমূল্য কীর্তি বাংলাদেশকে। কয়েক মাস পর বঙ্গবন্ধুকে বললাম, 'ও আমার দ্বারা হবে না, টেলিভিশন ছেড়ে দেব।' তার পরও নিস্তার নেই, আমাকে অধুনালুপ্ত দৈনিক *মর্নিং নিউজ*-এর সম্পাদকের পদে নিয়োগ দেন। সে সময় তৎকালীন জার্মান দূতাবাসের প্রেস সচিব মিস্টার ব্রিম আমাকে ও প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব আমিনুল হক বাদশাহ্‌কে তাঁর দেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতির জন্য বর্তমানের সুগন্ধা, পুরোনো গণভবনের দোতলায় বাদশাহ্‌কে নিয়ে একদিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর বিশ্রামঘরটিতে একটি আবেদনপত্র নিয়ে ঢুকে পড়লাম। তিনি আবার 'কী মুসিবত' বলে আবেদনপত্রটি হাতে নিলেন। পড়লেন, আমাদের দিকে চেয়ে নিজস্ব মুচকি হেসে আমার কাছ থেকে বলপয়েন্ট কলমটি নিয়ে দরখাস্তে কী যেন লিখে ফেরত দিলে বললেন, এবার বিদায় হও। আশান্বিত দৃষ্টিতে দরখাস্তের নিচে লেখাটি পড়লাম। লেখা, 'দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের বিদেশযাত্রার অনুমতি দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত —শেখ মুজিব'। দুজন নতমস্তকে বেরিয়ে এলাম। পরিতাপের বিষয়, পঁচাত্তরের দেশত্যাগের মর্মান্তিক ঘটনার পর স্বল্পকালীন সময়ের পর ফিরে এই অমূল্য নিদর্শনটি খুঁজে পাইনি। তাঁর আরও কয়েকটি স্বহস্তলিখিত নিদর্শন আমার কাছে থাকতে পারত। প্রথমটি ছিল ১৯৪৮ সালের ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ কনভেনশনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণপত্র। ছাপানো বা এখনকার মতো ফটোকপি করা নয়। তখনকার দিনের সাইক্লোস্টাইল মেশিনে কপি করা, ইংরেজিতে টাইপ করা। নিচে ইংরেজিতে পুরো দস্তখত—শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিলাম এবং নির্বাচিত হলাম। নির্বাচনী এলাকায় যাতায়াতের জন্য একটি গাড়ি দরকার। এ সময় একদিন দেখা হলো কর্নেল জাফর ইমামের (বীর উত্তম) সঙ্গে। তিনি তখন মিলিটারি পুলিশের প্রধান, মার্শাল জেনারেল অথবা এ ধরনের একটা নাম ছিল তাঁর সেই পদবির। তখন, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পর সামরিক পুলিশের উদ্যোগে পরিত্যক্ত বাড়িঘর ও বেওয়ারিশ গাড়ি উদ্ধার অভিযান চলছিল। জাফর ইমাম ওরফে সম্পর্কে হুমায়ুন মামা আমাকে জানালেন, সেনাবাহিনীর বেওয়ারিশ গাড়ি উদ্ধার অভিযানে পাওয়া একটি জিপ আছে অর্ডন্যান্স ডিপোতে। দেখা করলাম (বর্তমান ডেপুটি স্পিকার) অর্ডন্যান্সের পরিচালক কর্নেল শওকতের সঙ্গে। আগরতলা মামলা চলাকালীন অন্যতম আসামি কর্নেল শওকতের সঙ্গে আদালতেই পরিচয়, তারপর একাত্তরে কলকাতায় পাশাপাশি থাকার কারণে ঘনিষ্ঠতা। শওকত ভাই বললেন, 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি লাগবে।' অতঃপর গণভবনে প্রধানমন্ত্রী সমীপে হাজির হলাম। হাতে জিপটির বরাদ্দ চেয়ে আবেদনপত্র। তিনি এবার বুকপকেট থেকে ঝরনা কলম বের করে আবেদনপত্রে লিখলেন, 'জীবনে কখনো কোনো অন্যায় আবদার প্রশ্রয় দিই নাই, ভবিষ্যতেও দিব না। আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।' দুর্ভাগ্য, এই মহামূল্যবান পত্রটিও হারিয়ে গেছে।

আজ স্বল্প পরিসরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখার সময় যখন অনেক মধুর স্মৃতি, জানা-অজানা অন্তরঙ্গ কাহিনি রোমন্থন করছি, তখন শেষ দিনটির কথাও বলতে হয়। আজও ভাবলে রহস্যজনক মনে হয়, কেন জানি পঁচাত্তরের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে যাওয়ার পথে অথবা তাঁর কাছ থেকে পরিবারের বাইরের আপনজনদের দূরে সরিয়ে নিতে একটি অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কথাটির একটুখানি ব্যাখ্যা করছি। আজকের সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান বিশাল দপ্তর নয়, তাঁর তখনকার কার্যালয় গণভবনে কিছু সময়ের জন্য যখনই যেতাম, তাঁর কাছে থাকতেন তাঁর পরিচিত সচিব ও অতিরিক্ত সচিব। যাঁদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রফিকউল্লাহ চৌধুরী, ড. মশিহুর রহমান, মাহে আলম, ড. ফরাসউদ্দিন আর নূরুল ইসলাম

অনু। তাঁদের বদৌলতে গণভবনে ছিল আমাদের অনেকের অবারিত দ্বার। কখন কীভাবে প্রধানমন্ত্রীর চারদিকের আমলাতান্ত্রিক ব্যূহটি ভেঙে ফেলা হলো, তা নিজেরাও বুঝতে পারেননি। তা ছাড়া প্রায় প্রতিদিন সকালে ইকবাল রোডের বাড়ি থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটির পেছনের লোহার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যাওয়া যেত। সেটিও ছিল আমাদের সহজগম্য, সেখানে প্রায়ই মুজিব ভাই ও ভাবির সঙ্গে প্রাতরাশ করতাম। মাঝেসাঝে কাছেই থাকতেন অস্থায়ী তথ্য-সচিব বন্ধু বাহাউদ্দিন চৌধুরী, এককালীন ছাত্রলীগ নেতা। তিনিও মাঝেসাঝে এসে খাওয়ার টেবিলে বসতেন। পঁচাত্তরের প্রথম থেকেই আমাদের যাওয়া-আসার পথে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করলেন পূর্বোল্লিখিত সচিব-উপসচিবদের স্থলাভিষিক্ত একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা আবদুর রহিম। সাবেক এই পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন একাত্তরে রাজাকার বাহিনীর সংগঠক। কী করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর এত কাছে গেলেন, তা আমার কাছে এখনো রহস্যাবৃত। যখন অতীত পর্যালোচনা করি, তখন ভাবি, ১৫ আগস্টের আগের দিনগুলোয় পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বিশ্বাসভাজন আপনজনদের সম্পৃক্ততা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল কেন? কেন ৩২ নম্বরের একান্ত বিশ্বাসভাজন বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী আর পুলিশদের সরিয়ে সেনাবাহিনী থেকে পাহারাদার পাঠানো হলো? কেন এলিট ফোর্স রক্ষীবাহিনীকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো না? আমি পরবর্তীকালে এসব রহস্যজনক পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি কোনো এক প্রতিবেদনে।

সদর প্রবেশপথ থেকে টেলিফোনে রহিম সাহেবের অনুমতি নিয়েই ১৪ আগস্ট পড়ন্ত বেলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দিনের কাজ শেষে তিনি তখন গণভবনের ছোট্ট বাগানে পায়চারি করছেন। পাশে মহীউদ্দিন আহমদ, বরিশালের 'ন্যাপ মহীউদ্দিন' নামে যাঁর পরিচিতি ছিল। পেছনে তাঁর পরমপ্রিয় তোফায়েল আহমদ। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে পেছনে তাকালেন। যাঁর দুই ঠোঁটে সদা কৌতুকে ভরা হাসির আভা দেখা যেত, তাঁর চোখেমুখে দেখলাম বিষণ্নতার ছায়া। বহুদিন আগে আমি যে কারণে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, সেই একই কারণে এবারও তাঁর কাছে যাওয়া। লন্ডনের *সানডে টাইমস*-এর

আমন্ত্রণে একটা সেমিনারে যোগ দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আবেদনটি শুনলেন, বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'চলে যেতে চাস? যা, ফিরে এলে নিশ্চয়ই দেখা হবে, কী বলিস?'

মাঝেমধ্যে বেদনা ভারাক্রান্ত মনে একান্তে বসে ভাবি, তিনি কেন সেদিন ফেরার কথাটি বলেছিলেন? তবে তাঁর ভারাক্রান্ত মনের খবর জানতাম। কিছুদিন আগে চিলির রাষ্ট্রপতি আয়েন্দেকে হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএর পরিকল্পনা অনুসরণে দেশটির সেনাবাহিনী। তার মনেও কি এই ধরনের কোনো দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল?

রঙ্গরসে বঙ্গবন্ধু

কয়েক বছর ধরে আগস্ট মাস এলে আমি স্মরণ করি একান্ত আলোকে দেখা বঙ্গবন্ধুকে। স্মরণ করি অন্তর থেকে, কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করি না। তবে স্মৃতি রোমন্থন করি, একান্ত অন্তরঙ্গ আড্ডায় কীভাবে তিনি হয়ে পড়তেন দিলখোলা প্রাণমাতানো রঙ্গরসে ভরা মুজিব ভাই। প্রতিবছর ১৫ আগস্ট এলে পত্রিকায় আমার নিয়মিত কলামে সীমিত আকারে স্মৃতির মণিকোঠা থেকে তুলে আনি তেমনই কিছু ঘটনা।

আমি বঙ্গবন্ধুকে কখনো রাগতে দেখিনি, তবে কোনো রাজনৈতিক আলোচনার সময়ে তাঁর ক্ষুব্ধ চেহারা দেখেছি। ঘরোয়া আড্ডায় মাঝেমধ্যে নানা বিষয়ে রঙ্গ-কৌতুক ও রসিকতা করতেন। প্রথমে মনে পড়ছে, তিনি কীভাবে মিমিক মানে অন্যের গলা নকল করে গল্প শোনাতেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের আগ থেকেই আওয়ামী লীগের তখনকার সিম্পসন রোডের অফিসে যেতাম। কাছেই ছিল আমার কর্মক্ষেত্রে জনসন রোড তথা লিয়াকত অ্যাভিনিউয়ে *পাকিস্তান অবজারভার*। সময় পেলেই সেখান থেকে যেতাম আওয়ামী লীগ অফিসের কোনো একটি ছোট কক্ষে বসা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিব ভাইয়ের জমজমাট আসরে।

এমনই এক আসরে গিয়ে ছিলাম ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার পর। ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগ আর শেরেবাংলা-আবু হোসেন সরকারের কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে ভাঙন

ধরিয়েছিলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ। ফ্রন্টের দুই ভাগীদ্বয়ের মধ্যে কারা পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রিত্বের (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) দাবিদার, সেটা নির্ধারণ করতে কার্জন হলে দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকে বসলেন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ। উল্লেখ্য, পাকিস্তান তখনো ব্রিটিশ আশ্রিত ডমিনিয়ন। তাই মহারানির মনোনীত গভর্নর জেনারেল ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র হয়েছে ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান রচনার পর। একান্ত বৈঠকটিতে সাংবাদিক আর তখনকার মধ্যম কাতারের রাজনৈতিক নেতা মুজিব ভাইয়ের ছিল প্রবেশ নিষেধ। কী আলাপ হয়েছিল সেই বৈঠকে, তা জানতে আমরা মুজিব ভাইকে বললাম, হক সাহেবের কাছ থেকে কিছু জানা যায় কি না! তিনি গেলেন হক সাহেবের কাছে। ফিরে এলেন হাসতে হাসতে। কার্জন হলের বাইরের বাগানে ঘাসের ওপর আমাদের নিয়ে গোল হয়ে বসলেন। জানালেন তিনি শেরেবাংলার কাছে গিয়েছিলেন। শেরেবাংলা ও গোলাম মোহাম্মদের মধ্যে হওয়া কথোপকথনের বিবরণ জানতে চাওয়ায় হক সাহেব কী উত্তর দিয়েছেন, দিতে লাগলেন তার বিবরণ। হক সাহেবকে নকল করে আধো-আধো স্বরে মুজিব ভাই বলতে লাগলেন, 'ওতা একতা ওথোর্ব। ওতার কোথা কুছু বোঝা যায় না।' বলা নিষ্প্রয়োজন 'ওতা' মানে গোলাম মোহাম্মদ। মুজিব ভাইয়ের কথা নকল করার ভঙ্গিতে আমরা হাসতে থাকলাম। তবে বুঝলাম, হক সাহেব সত্য কথা এড়িয়ে গেছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের কয়েকটি গল্প বলি। বঙ্গবন্ধু আমাকে প্রথমে টেলিভিশনের মহাপরিচালক, পরে দৈনিক *মর্নিং নিউজ*-এর সম্পাদক করলেন। ইংরেজি দৈনিকটা ছিল পরিত্যক্ত সম্পত্তি, সাংবাদিক-কর্মচারী অবাঙালি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকে আগেই পাকিস্তানে চলে গেছেন। ইংরেজি লেখার সাংবাদিক নেই। এরই মধ্যে একদিন আমার বন্ধু জ্যাক—জাকারিয়া খান চৌধুরী, পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা—দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার পর স্বাধীন বাংলাদেশে চলে এল, সঙ্গে স্ত্রী স্থপতি শামিম শিকদার। সে একদিন আমার দপ্তরে এসে বলল, 'দোস্ত, ফিরে এসেছি, এখন চাকরি দে।' জ্যাক খুব ভালো ইংরেজি জানত। তাকে *মর্নিং নিউজ*-এর সহকারী

সম্পাদকের পদে নিয়োগ দিলাম। এরপর একদিন বিকেলে তাকে বললাম, 'দোস্ত, চলো গণভবনে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।' বস্তুত, তখন প্রতিদিন পুরোনো গণভবনে, বর্তমান 'সুগন্ধা'র পেছনের বারান্দায় সন্ধ্যায় মুজিব ভাই আমাদের অনেকের সঙ্গে গালগল্প করতেন। জ্যাক পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াতেই মুজিব ভাই বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এটাকে আবার কে নিয়ে এল?'

উল্লেখ্য, জ্যাকের সিলেটের বনেদি পরিবারের সবাইকে বঙ্গবন্ধু ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। আমি বললাম, জ্যাক ফিরে এসেছে, ওকে আমার কাগজে নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'তা ওর কাজ কী?' বললাম, সম্পাদকীয় আর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উপসম্পাদকীয় লিখবে। শুনে তিনি বললেন, 'বেশ ভালো।' তারপর স্বভাবজনিত মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'যা লেখাবার সন্ধ্যার আগে লেখাবি। খবরদার, সন্ধ্যার পরে যেন কিছু না লেখে।' ইঙ্গিতটা বুঝে জ্যাক লজ্জায় লাল। আর আমরা তো হো-হো করে হেসে উঠলাম। প্রধানমন্ত্রীর পরিহাসটি ছিল জ্যাকের প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিশেষ পানীয় পানের কারণে বেহাল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

একদিন গণভবনের সান্ধ্য আসর বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় উত্তেজিত তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এসে উপস্থিত, 'নেতা, এই যে গাফ্‌ফার কী লিখেছে আমার সম্পর্কে দেখেছেন? লিখেছে, আমি নাকি সরাইলের কুকুর।' বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলেন, কেসটি কী? যা জানা গেল, তা হলো, গাফ্‌ফার তখন মন্ত্রী কামরুজ্জামান হেনা ভাইয়ের সদ্য প্রকাশিত *দৈনিক জনপদ*-এর সম্পাদক। তাহের ঠাকুর সেই পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়ায় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী তথ্য মন্ত্রণালয়ের কড়া সমালোচনায় প্রতিমন্ত্রীকে 'সরাইলের সারমেয়' লিখেছিলেন। সরাইলের কুকুরকে তখন বিলেতি অ্যালসেসিয়ানের পর্যায়ের দুর্ধর্ষ মনে করা হতো। প্রতিমন্ত্রী ঠাকুরের আদি বাড়ি সেই এলাকায়।

ঠাকুরের নালিশ শুনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন মুজিব ভাই। গাফ্‌ফারের দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন, 'অন্যায় করেছ! তাহেরকে সরাইলের কুকুর বলা ঠিক হয়নি। জানো, কত প্রজাতির কুকুর আছে?' তারপর বলতে শুরু করলেন, 'বিলেতি মেমসাহেবরা কোলে বসিয়ে

ল্যাপডগকে আদর করেন। অস্ট্রেলিয়ায় রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল সামলায় শেফার্ড কুকুর লেলিয়ে দিয়ে। উত্তর মেরুর বরফের ওপর চাকাবিহীন এস্কিমোদের বাহন টেনে নিয়ে যায় স্লেজ কুকুর। বিলেতের অভিজাত জমিদার ডিউকেরা বছরে একবার শিয়াল শিকারে বের হয়। প্রথমে জঙ্গলে ছেড়ে দেয় হান্টিং ডগ। সেই সব ভয়ংকর-দর্শন কুকুর শিয়ালদের তাড়া করে। তাদের পেছনে ঘোড়ার পিঠে থাকে শিকারিরা। ইউরোপে অ্যালসেসিয়ান কুকুর বাড়ি পাহারা দেয়। দুর্ধর্ষ এসব অ্যালসেসিয়ান অনেকটা সরাইলের কুকুরের মতো দেখতে, পাতলা লম্বা ভয়ংকর-দর্শন।' তারপর গাফ্‌ফারকে বললেন, 'আমার ভজহরির মতো এমন ঘাড়ে-গর্দানে নাদুসনুদুস, ফরসা, তবে হ্যাঁ, রাগলে লালমুখো হয়ে যায়, একধরনের কুকুরও আছে বৈকি। সেগুলো হলো বুলডগ, লালমুখো, মোটাতাজা শরীর।' আড় চোখে সুদর্শন নাদুসনুদুস তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থেমে গিয়ে দুষ্টুমি ভরা গলায় বললেন, 'গাফ্‌ফার, খবরদার এরপর কারও চেহারা-সুরত নিয়ে ঠাট্টা করবা না।' কথাগুলো বলেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর মুখে ঠেকানো পাইপটির তামাকে আগুন দেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমরা হাসি লুকানোর জন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুখ তুলে দেখি, লালমুখো ঠাকুরমশাই ততক্ষণে উধাও।

নিজের মন্ত্রীদের নিয়ে মাঝেমধ্যেই রসিকতা করতেন বঙ্গবন্ধু। দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু ১১ জানুয়ারি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর বিকেলবেলা সংবাদ সম্মেলন করার পর যথারীতি আমাদের সঙ্গে সান্ধ্য আড্ডায় বসলেন। তখনো মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন হয়নি। এ নিয়ে আমরা একটুখানি কৌতূহল প্রকাশ করায় তিনি কৃত্রিম গম্ভীরতার সঙ্গে জানালেন, 'সব এখন বলব না, একটু পরই জানতে পারবা। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যথাযথ দায়িত্ব দিয়েছি। তবে একটা দপ্তর নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। অনেক ভেবেচিন্তে সেটা জহুরের কাঁধে চাপালাম। দপ্তরটি হচ্ছে স্বাস্থ্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণ (পরবর্তীকালে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)। ভেবে দেখলাম, আমার মতো সারা জীবন জেল খাইটা তার শরীরডা খ্যাংরা কাঠির মতো হইয়া গেছে। সব ডাক্তারকে সে মাইনষের স্বাস্থ্য ভালো করার তাগিদ দিতে পারব। সে আবার দুই

বউয়ের ১৪টি বাচ্চা নিয়ে হিমশিম খাইতাছে। বেশি বাচ্চা হওয়ার জ্বালা সে-ই ভালো বোঝে। তাই তারে জন্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়েছি।'

রঙ্গে ভরা বঙ্গবন্ধুর রসের ভান্ডার থেকে দুটি রসকদম্ব পাঠকদের উপহার দিয়ে নিবন্ধটি শেষ করব। প্রথম ঘটনাটি বাহাত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরের সময়ের। বঙ্গভবনে অনুষ্ঠান শেষে তিনি ১৪ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী প্রত্যেকের হাতে উপহারস্বরূপ একটি করে ভারতীয় বেঙ্গালুরু সিল্কের শাড়ি দিলেন। বলা বাহুল্য, শাড়িগুলো মন্ত্রীদের বেগম সাহেবদের জন্য। শাড়ি বিতরণ শেষ, মন্ত্রীরা ইন্দিরা গান্ধীকে সমবেতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এমন সময় দূর থেকে এগিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু। তৎকালীন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের শাড়িখানি প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে জহুর আহমদ চৌধুরীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। ইন্দিরাজি অবাক হয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, 'মনোরঞ্জন ধর ব্যাচেলর মানুষ। তাঁর শাড়ির দরকার নেই। বেচারা জহুরের দুই বউ। এক শাড়ি নিয়ে দুজনে টানাটানি করবে। তাই তাঁরটি জহুরের আরেকটি বউয়ের জন্য দিলাম।'

দ্বিতীয়টি হলো, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ একটা কর্মসূচি নিয়ে তাঁর হালকা মন্তব্য। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সিলেটের ভূ-অভ্যন্তরে গ্যাস আগেই পাওয়া গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে কতিপয় বিদেশি কোম্পানি এসেছে গ্যাস অনুসন্ধানে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন প্রধানমন্ত্রী, খনিজ সম্পদমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনও। বৈঠক শেষে গণভবনের পূর্ব বারান্দায় যথারীতি বসেছে আড্ডা তথা খোশগল্পের আসর। সেখানে একটু আগে সম্পন্ন হওয়া বিদেশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলাপের প্রসঙ্গটি এল। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কয়েকটি বিদেশি অনুসন্ধান কোম্পানিকে আমি বলেছি, শুধু গ্যাস নয়, আমাদের তেলও আছে। তারা জানতে চাইল, এ নিয়ে অতীতে কোনো অনুসন্ধান হয়েছি কি না। আমি বলেছি, তা হয়নি। তবে আমি নিশ্চিত, আমাদের তেল আছে। আরব দেশগুলোয় তেল পাওয়ার যে দুটি ক্রাইটেরিয়া তথা যথার্থতা রয়েছে, তা আমাদেরও আছে।' তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু বুজলা?'

আমরা দুদিকে ঘাড় নাড়লাম। বঙ্গবন্ধু কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তাগোরে কইলাম, তেল পেতে হলে দেশটির দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, যা আমাদের আছে। এক. মুসলিম দেশ হতে হবে। দুই. ইট মাস্ট বি হেডেড বাই শেখ। রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানকে শেখ হতে হবে।' কথাগুলো বলে দিলখোলা বঙ্গবন্ধু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

প্রেরণাদায়িনী ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

আইন করে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুতনয়া বাস করেন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে। এ কারণে নতুন আইন অনুসরণে তাঁর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তাবেষ্টনী থাকা স্বাভাবিক। পঁচাত্তরের আগে এই নিরাপত্তাবলয়টি যথেষ্ট না হলেও সামান্য পরিমাণে ছিল গণভবন আর বঙ্গভবনে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডটি ১৫ আগস্টের খুনিরা এত সহজে বিনা বাধায় করতে পেরেছিল ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটির অবস্থানের কারণে। সেখানে একই মাত্রার সামান্যতম নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাসস্থান ছিল গণভবন (পুরোনো ও নতুন)। পঁচাত্তরে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর বঙ্গভবনে থাকাটাই তো ছিল স্বাভাবিক। প্রথমোক্ত দুই জায়গার কোনো একটিতে থাকলেই সেদিন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড তাঁর মুষ্টিমেয় দেহরক্ষীরা প্রতিহত করতে পারতেন। অনেকে মনে করেন, হয়তো পারতেন অথবা পারতেন না। তখন প্রধানমন্ত্রীর জন্য এসএসএফ বা বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী গঠিত হয়নি। বঙ্গভবনে না থাকার কারণে সেখানকার বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

অনেকের এই সকল মত যদি গ্রহণ করি, তবে প্রশ্ন হলো, কর্মমুখর সারাটি দিনের শেষে ক্লান্ত শেখ মুজিব ভবন দুটির সুরক্ষিত দুর্গে না থেকে কেন অরক্ষিত ৩২ নম্বরের বাড়িতে রাত কাটাতে আসতেন? উত্তর একটি, বেগম মুজিব ৩২ নম্বর বাড়িটির দোতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের

ঘরটি ছেড়ে আসতে রাজি হননি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথি হয়ে অথবা রাষ্ট্রপতির পত্নী পরিচয়ে 'ফার্স্ট লেডি' হতে চাননি। বহু বছর আগে স্বামীর সঙ্গে গ্রাম্য বধূর যে লেবাসটি পরে এসেছিলেন, গণভবন বা বঙ্গভবনে এসে তা ছাড়তে চাননি। তিনি রাজনীতিতে নিবেদিত জননেতা স্বামীর দীর্ঘ রাজনৈতিক দুর্যোগপূর্ণ সময়ের সহযাত্রী ও সহমর্মী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশীদার হওয়ার কোনো বাসনা তাঁর ছিল না। তার পরও স্বামীর জীবনযুদ্ধে, আদর্শের সংগ্রামে, এমনকি জনসম্পৃক্ততায় তাঁর একটি অপ্রকাশ্য ভূমিকা অবশ্যই ছিল। পারিবারিক জীবনে সুখ-দুঃখের ভাগীদার যেমন ছিলেন, তেমনি রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন তাঁর আদর্শের 'প্রেরণাদাত্রী বিজয়লক্ষ্মী নারী'। কথাটি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তপার্লামেন্টারি বৈঠকে নজরুলের একটি কবিতাংশ উদ্ধৃতির মাধ্যমে। নজরুলকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেছিলেন, 'জগতের যত বড় জয় বড় অভিযান/ মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।' সেসব মাতা ও বধূদের উদাহরণে যোগ করেছিলেন একটি নাম—ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। গান্ধীজির কথা যেমন লোকে জানে, তেমনি কস্তুরবার কথা ইতিহাসে সামান্য পরিমাণে হলেও স্থান পেয়েছে। তিনি চরকা কেটেছেন, স্বামীর সঙ্গে জেলে গিয়েছেন। জওহরলাল নেহরু যেমন আলোচিত হয়েছেন, তেমনি বারবার উচ্চারিত হয়েছে কমলা নেহরুর কথা। রাজনীতিতে তিনি স্বামীর সাথি হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, কারাবরণ করেছেন। গান্ধী বা নেহরু যতবার বা যত দিন জেলে ছিলেন, বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের সময়কাল তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু ফজিলাতুন্নেসা তো স্বামীর কারাসঙ্গী ছিলেন না। তখন কোথায় ছিলেন, কী অবস্থায় ছিলেন মুজিবপত্নী, কীভাবে নিত্যদিনের অভাবের সংসার চলেছে, চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যেও ছেলেমেয়েদের কীভাবে আগলে রেখেছেন, সেই সব কাহিনি কেউ জানে না, জানতে চায়ও না। তাই তো ১৫ আগস্টে শোকের বন্যায় ভেসে যাঁরা সেমিনার আর স্মরণসভা করেন, তাঁরা কেউ এসব কথা বলেন না, ফজিলাতুন্নেসার নামটিও সচরাচর উচ্চারণ করেন না। জীবন ও যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি যে নারীর জীবন থেকে বারবার

ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাঁর কথা কেউ তেমন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবেন না। কারণ, বোধ হয় বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব একজন সাধারণ গৃহবধূ হয়েও রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বা প্রকাশ্যে সংশ্লিষ্ট না থেকেও অন্তরালে থেকে যে অবদান রেখেছিলেন, তার সমস্ত বিবরণ সবার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে কেউ কেউ 'বঙ্গমাতা' সাইনবোর্ড সাঁটিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠান করেছেন বৈকি।

অন্তরঙ্গ আলোকে সেই মহীয়সী নারী সম্পর্কে অনেকের অজানা কিছু কাহিনি বিবৃত করছি। স্বামীর রাজনীতির সঙ্গে তাঁর পরোক্ষে বৈচিত্র্যময় সংশ্লিষ্টতার কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো। রাজনীতির উন্মাদনায় ছুটে বেড়ানো শেখ মুজিবের পত্নীকে আমি দেখেছি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির পত্নী ফার্স্ট লেডিকে দেখিনি। দেখেছি আটপৌরে শাড়ি পরনে পালঙ্কে বসে বাটা হাতে পান সাজাতে। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে রাষ্ট্রীয় বাহনে তাঁকে দেখা যায়নি, দেখা যায়নি তাঁর সাথি হয়ে বিমানে করে রাষ্ট্রীয় সফরে যেতে। সভা-সেমিনার ও সংবর্ধনা সভায় রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের জর্জেট পরা অর্ধাঙ্গিনীকে দেখতে কেউ উঁকি মারেননি। কারণ, সুদূর গ্রাম থেকে যে গ্রাম্য কিশোরীর ছাপটি মুখে নিয়ে স্বামীর হাত ধরে শহরে এসেছিলেন, সেটি কোনো দিন মুছতে দেননি তিনি। দেখেছি, ৩২ নম্বর বাড়ির দোতলায় বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে জাঁতি দিয়ে সুপারি কাটছেন, মুখে পান। হাতের ওপরে চুন। কোনো দিন সকালবেলা বাড়ির পেছনের সিঁড়িটি বেয়ে দোতলায় শোবার ঘরের দরজায় উঁকি মারতেই বলতেন, 'আসুন, পান খান।' আমাকে যখন পানটি এগিয়ে দিতেন, পাশে আধশোয়া মুজিব ভাই পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে পাইপ-ধরা মুখের ফাঁক দিয়ে মৃদু হাসতেন। আমার দিকে তাকিয়ে সুর করে বলতেন, 'বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।' এই ছিল মুজিব-গিন্নির ঘরোয়া রূপ। এই ঘরোয়া পরিবেশের আকর্ষণে সুরক্ষিত ভবন ছেড়ে রাতে অরক্ষিত ৩২ নম্বরের জৌলুশহীন বাড়িতে ফিরতেন প্রধানমন্ত্রী, পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি।

আচ্ছা, সেই পানের বাটাটি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে তেমনই সাজানো আছে কি? জানি না, কারণ ১৫ আগস্টের পর কোনো দিন সেই বাড়িতে

যাইনি। এই পিতলের পানের বাটায় থরে থরে সাজানো থাকত পান, সুপারি, জর্দা, দোক্তা ও সাদাপাতা। এ নিয়ে কৌতুককর একটি কাহিনি মনে পড়ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় এলেন, রেসকোর্স ময়দানে নির্মিত হলো 'ইন্দিরা মঞ্চ'। জীবনে সেই প্রথম অন্দর থেকে বাইরে এসেছিলেন। পরে জেনেছি, বঙ্গবন্ধু বহু খোশামোদ করে বেগম সাহেবকে সেই মঞ্চে আনতে পেরেছিলেন। চিরকাল আটপৌরে শাড়ি পরা বেগম মুজিব সেদিন বহু আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টায় একটি কাতান পরেছিলেন। মঞ্চের কাছাকাছি ছিলাম বলে দেখলাম, এক হাতে বারবার কাতান শাড়িটি সামলাচ্ছেন, অন্য হাতে পানের বাটাটি ধরে আছেন। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কয়েক লাখ মানুষের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রের সবচেয়ে সম্মানিত মহিলাটি আঁচলের আড়ালে পানের বাটা আগলে রেখেছেন। দেখে আমারই হাসি পাচ্ছিল। অদূরে বসে শুনলাম, বঙ্গবন্ধু মৃদুস্বরে ধমকে উঠলেন, 'ওটা আবার নিয়ে আসলা ক্যান?' বেগম মুজিবের মুখে দেখলাম অপ্রস্তুত হাসি। তারপর বাটাটি আঁচলের তলে ভালো করে ঢাকা দিতে থাকলেন। এ হচ্ছে সেই সহজ-সরল চিরায়ত গ্রাম্যবধূ প্রধানমন্ত্রী-জায়ার চিত্ররূপ।

আজ এই সাদাসিধে গৃহিণীর কাহিনি বিবৃত করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। নজরুলের ভাষায় 'শক্তি-সাহস জুগিয়েছে' যে নারী, তাঁর অন্য পরিচয়ও পেয়েছি। সেই পরিচয়ে রয়েছে একজন প্রেরণাদানকারী মহিলার এ দেশের রাজনৈতিক পালাবদলে যুগান্তকারী অবদান। সেই কাহিনি নেহাত কিংবদন্তি নয়, হলেও সেই কিংবদন্তি ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ভেস্তে যাওয়ার ইতিহাসভিত্তিক।

ঢাকা সেনানিবাসে সেই কথিত ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলছে। ১৯৬৯ সাল। সারা দেশ তখন আগুনে জ্বলছে। 'জেলের তালা ভাঙব/ শেখ মুজিবকে আনব'—স্লোগানে রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুবের ক্ষমতার মঞ্চ কেঁপে উঠেছে। গণ-অভ্যুত্থানে বিধ্বস্ত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে গোলটেবিল বৈঠক হয় কী করে? শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বৈঠক সফল করতে রাজনৈতিক নেতাদের চাপে বাধ্য হলেন কারাবন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে আমন্ত্রণ জানাতে। কিন্তু

দেশদ্রোহের দায়ে বিচারের আসামি, ক্যান্টনমেন্টে বন্দী, আসবেন কীভাবে? অবশেষে আইয়ুব খান সিদ্ধান্ত নিলেন প্যারোলে মুক্তি দিয়ে তাঁকে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হবে। ফেব্রুয়ারির ১৭ বা ১৮ তারিখ থেকে বিভিন্ন মহল শেখ সাহেবকে প্যারোলে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে থাকে। গোলটেবিল বৈঠক থেকে তৎকালীন রাজনৈতিক ফ্রন্ট এনডিএফের নেতা মৌলভী ফরিদ আহমদ সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুরোধ জানান প্যারোলে মুক্তি নিতে। একই সঙ্গে তাঁর ঢাকার অন্তরঙ্গ দুজন প্রভাবশালী সম্পাদক জেলে দেখা করে তাঁকে একই অনুরোধ জানান। ঢাকায় তখন তাঁর মুক্তির দাবিতে কারফিউ ভেঙে রোজ রাতে মানুষের ঢল নামছে রাস্তায়। এরই মধ্যে প্যারোলের বার্তা রটে গেল জনগণের কাছে। চলছে জল্পনা-কল্পনা, শেখ সাহেব কি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আইয়ুবের বৈঠকে যাবেন?

ক্যান্টনমেন্টে বসে শেখ সাহেব কী ভাবছেন, কেউ তা জানে না। সারা দেশের মানুষও কিছুটা বিভ্রান্ত। তারা প্রাণ দিচ্ছে, রক্ত দিচ্ছে প্রিয় নেতাকে মুক্ত করে আনার জন্য, মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যাওয়ার জন্য নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন যিনি, তিনিও ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। সেদিন মুচলেকা দিয়ে, নাকি নিঃশর্ত মুক্তি—এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন একজন নারী। মুজিবের সহধর্মিণী, যিনি রাজনীতি বুঝতেন না; কিন্তু নিজের স্বামীকে জানতেন। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামীর মানসিক দ্বন্দ্ব। বন্দী স্বামীকে খবর পাঠালেন, 'হাতে বঁটি নিয়ে বসে আছি, প্যারোলে মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যেতে পারেন; কিন্তু জীবনে ৩২ নম্বরে আসবেন না।'

এখন ভাবতে অবাক লাগে, আধাশিক্ষিত সাধারণ যে গৃহবধূ রাজনীতি বোঝেন না, অথচ সেই তিনি রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করে কী অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন! কতখানি রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নিয়ে দূর থেকে শক্তি, সাহস আর বুদ্ধি জোগালেন স্বামীকে! সত্যিই তিনি এ ধরনের কোনো খবর পাঠিয়েছিলেন কি না, তা কোনো দিন জানতে পারিনি। অনেক দিন পর ভাবির সামনেই বঙ্গবন্ধুর কাছে এর সত্যতা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি হেসে আঙুল দিয়ে ভাবিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওনাকে জিজ্ঞেস করবি না?' ভাবির দিকে তাকাতে

তিনি মুচকি হেসে এক খিলি পান এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওসব থাক।' এ দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো যদি কিংবদন্তি সত্যি না হতো, শেখ মুজিব যদি মুচলেকা দিয়ে সহবন্দীদের ক্যান্টনমেন্টে রেখে রাওয়ালপিন্ডি যেতেন।

প্রকৃতপক্ষে বেগম মুজিব স্বামীর প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থেকেও দেশে কী ঘটছে, জনগণ কী ভাবছে আর বলছে, তার খোঁজখবর রাখতেন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালক স্বামীর কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতেন না। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। স্বাধীনতার পর আমি যখন *মর্নিং নিউজ*-এর সম্পাদক, তখন ওই পত্রিকাটির বিলি-বণ্টন নিয়ে হকার্স সমিতি ও বণ্টনের দায়িত্বে নিযুক্ত এজেন্সির মধ্যে বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌছালে পুলিশি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। ঢাকার তখনকার এসপি মাহবুবকে বঙ্গবন্ধুর একজন স্নেহভাজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার মালিক-সম্পাদক আমাদের বিরুদ্ধে হকার্স সমিতির পক্ষে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। অবস্থা গুরুতর পর্যায়ে পৌছালে রাত বারোটায় *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও আমি ৩২ নম্বরে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এসে তাঁকে সব অবহিত করলাম। সবকিছু শুনে প্রধানমন্ত্রী কিছু বলার আগেই ভাবি পরমাত্মীয় সম্পাদক-মালিকের নাম করে বলেন, 'এদের কথাই তোমাকে বারবার বলেছি। এরাই শেষ পর্যন্ত তোমার কাল হবে।' শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গড়িয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। তবে এটুকু বুঝেছিলাম, ৩২ নম্বরে খাটের ওপর বসে তিনি শুধু পান বানাতেন না। সারা দেশের রাজনীতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কোনো পদক্ষেপে তাঁর উদ্বেগের কারণ ঘটালে তা প্রকাশ করতেন। এমনকি বাকশাল গঠন করার পর, শুনেছি, তিনি নাকি মুজিব ভাইকে বলেছিলেন, 'এবার থেকে তুমি এই বাসায় নয় তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গণভবনেই থাকবে।' বেগম মুজিব কি তাঁর দূরদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন? তাই নিছক উষ্মা প্রকাশ করে নয়, সত্যিই তাঁর নিরাপত্তা-ভাবনা থেকেই কথাটি বলেছিলেন বলে এখন মনে হচ্ছে।

গান্ধীপত্নী কস্তুরবা, নেহরুর কারাসঙ্গিনী কমলা, দেশবন্ধুর সহধর্মিণী

বাসন্তী দেবী বা ম্যান্ডেলা-পত্নী উইনি ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু বাঙালি জাতির মুক্তিদাতার স্ত্রী শক্তিদায়িনী, প্রেরণাদায়িনী মহিলার স্থান কেন বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় থাকবে না? আমার এই আফসোস অনেকখানি মিটিয়েছে কয়েক দিন আগে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মুজিবপত্নী স্মরণে টিএসসিতে একটি স্মরণসভার আয়োজন করে। সেই সভায় এ জন্য তাদের মোবারকবাদ জানিয়েছিলাম।

পরিশিষ্ট : সারা শহরে এখন কালো ব্যানারের ছড়াছড়ি। ব্যানারের এক প্রান্তে বঙ্গবন্ধু, অন্য প্রান্তে শেখ হাসিনা কেন? ফজিলাতুন্নেসা মুজিব নয় কেন?

স্মৃতিতে কামাল-জামাল-রাসেল

কয়েক দিন আগে পালিত হলো শেখ কামালের জন্মদিন। আর দুদিন পর তাঁর মৃত্যুদিন, ক্রন্দনময়-স্মৃতিবিজড়িত ১৫ আগস্ট। সেদিন সবার সঙ্গে নিহত বঙ্গবন্ধুর তিন ছেলের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয়পর্বটি শুরু করব ছোট্ট রাসেলকে দিয়ে। একদিন বিকেল পাঁচটার দিকে শাঁ করে ৩১ নম্বর রাস্তা থেকে ৩২ নম্বরে ঢুকেই আমার সামনে একজন একেবারে পপাত ধরণীতল। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সদ্য শৈশবোত্তীর্ণ ছেলেটা। তারপর সরাসরি প্রশ্ন, 'চাচা, আমাদের বাড়ি থেকে এলেন? মার সঙ্গে দেখা হয়েছে?' বললাম, যাইনি, তবে ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাব। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সাইকেলে উঠে লেকপাড়ের রাস্তায় ছুটল কিশোর।

মুজিব-ফজিলাতুন্নেসা দম্পতির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, বড় আদরের প্রশ্রয় পাওয়া দুরন্ত রাসেল। সকালে সাইকেলে চেপে যেত ধানমন্ডির ল্যাবরেটরি স্কুলে। বিকেলে লেকের উত্তর পাড়ে এমনই করে চক্কর মারত। পূর্ব দিকের ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে লেকের ওপরের সেতু আর পূর্ব প্রান্তের সাদা একটা দালান পর্যন্ত সাইকেলারোহীর দৌড়ানোর সীমানা। পুবের রাস্তার এক মাথায় সেই বাড়িতে থাকতেন বড় বোন শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়া। একেবারে এক পাশে এক কামরায় প্রধানমন্ত্রীর উপতথ্যসচিব আমিনুল হক বাদশা। এদিকে ৩২ নম্বরের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্নেহময়ী মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন দুষ্টু ছেলেটার সাইকেল পরিক্রমা যেন

নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন হাসিনা। ওপর থেকে উচ্চ স্বরে সাবধানবাণী ভেসে আসত, 'ওরে দুষ্টু, মিরপুর রোডে যাবি না।'

একাত্তরের ১৫ আগস্ট নিষ্ঠুর ঘাতক কেড়ে নিল ছোট্ট প্রাণটি। বড় দুই ভাই কামাল-জামালের একেবারে বিপরীত চরিত্রের রাসেল। আমি ৩২ নম্বরের বাড়িতে নিত্য সকালে আনাগোনার সময় দেখতাম, দুমদাম করে টেবিলে এসে একটুখানি কিছু খেয়েই স্কুলের যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেল ছোট্ট ছেলেটি। একদিন প্রাতরাশের টেবিলে সকৌতুক মন্তব্য করেছিলাম, 'মুজিব ভাই, বড় দুই ভাইয়ের নাম কামাল-জামাল, এই দুষ্টুটির নাম "দামাল" রাখলেন না কেন?' মুজিব ভাই হেসে বললেন, 'তোর ভাবিকে জিজ্ঞেস কর। আমি তো জেলে-জেলেই কাটালাম, কে কখন এল, কার নাম কী রাখা হলো, তা জানতাম নাকি!' ভাবি কী বুঝলেন কে জানে। কৃত্রিম লজ্জা-মেশানো রুষ্ট স্বরে বললেন, 'কখন কী বলেন কথার আগাপাছা থাকে না।' ছোট ছেলেটিকে কিছু বলার আগেই 'পাগলী মায়ের দামাল ছেলে' সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আদরের ছেলেটা স্কুলে গেল অথচ সঙ্গে কোনো বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না।

একাত্তরের ১৫ আগস্ট যখন শহীদ হলো জামাল, তার কিছুদিন আগে যুদ্ধ শেষে সদ্য কমিশন পেয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। বাপ-মা-ভাই-বোনদের সুখবরটি দিতে বাড়িতে এসেছিল। ১৪ আগস্ট রাতেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। শুনেছি, বেগম মুজিব স্নেহভরে তাকে বলেছিলেন, 'আজ রাতটুকু থেকে ভোরে যাস।' জামালের ক্যান্টনমেন্টে আর যাওয়া হয়নি। ২৫ মার্চ রাতে মা-বোন ও ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গে জামালকে পাকিস্তানি বাহিনী ধানমন্ডি ১৮ অথবা ১৯ নম্বর রাস্তার একটি বাড়িতে বন্দী করে রেখেছিল। এখান থেকেই হাসিনাকে পিজি হাসপাতালে, বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময় নিয়ে গিয়েছিলেন বর্তমান জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম। সেখানেই জন্ম নিয়েছিল জয়, যেন বাংলার মানুষের 'জয় বাংলা' কামনার একটি প্রতীকী সূচনা। পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধুই নাকি একসময় তাঁকে বলেছিলেন,

'আমার নাতির নাম হবে জয়, নাতনি হলে হবে জয়া।'

জামাল মা-বোনদের সঙ্গে গৃহবন্দী হওয়ার আগেই কামাল ২৬ তারিখের সন্ধ্যায় সীমান্ত পার হয়ে মুজিবনগর চলে গিয়েছিল। এদিকে একদিন সকালে বন্দিনী মা আবিষ্কার করলেন মেজো ছেলে জামাল উধাও। বেগম মুজিব পাকিস্তানিদের দায়ী করলেন শেখ জামালকে গুম করা হয়েছে বলে। অভিযোগ করলেন, পাকিস্তানি সেনারা অপহরণ করে তাকে হত্যা করেছে। সারা বিশ্বে আলোড়ন, বিদেশি পত্রপত্রিকায় ছাপা হলো, পাকিস্তানিরা শেখ মুজিবের মেজো সন্তানকে গায়েব করেছে। ভারত সরকার সারা বিশ্বে তোলপাড় শুরু করলেন। সেই জামালকে আমি আবিষ্কার করলাম বোধ হয় মুক্তিযুদ্ধের ৫ নম্বর সেক্টরে।

পরবর্তী ঘটনা বিবৃত করার আগে বলে নিই, জামালকে আমার বরাবরই মনে হতো নিরীহ অমিশুক চরিত্রের। কোনো দিন সকালে ৩২ নম্বরে গেলে খাবারঘরের পশ্চিম কোণে একটি ছোট্ট ঘরে তাকে দূর থেকে লেখাপড়া করতে দেখতাম। সেই মুখচোরা লাজুক তরুণকে, সদ্য আইএ তথা এইচএসসি পাস করা এক অসমসাহসী আরেক জামালের দেখা পেলাম যুদ্ধ এলাকায় একটা পরিখায় অস্ত্র হাতে (চায়নিজ রাইফেল)। সাংবাদিকেরা যাকে বলে 'স্কুপ', সেই সুযোগ ছাড়তে আছে! আমি তখন মুজিবনগরে বিবিসি, লন্ডনের *দ্য টাইমস* ও *সানডে টাইমস*-এর জন্য খবর সংগ্রহ করছি। এই চমক লাগানো খবর আবিষ্কার করে আমার ক্যানন এসএলআর ক্যামেরায় জামালের ছবি তুলে পাঠালাম লন্ডনের *দ্য টাইমস*-এ। সেই খবর আর ছবি ছাপা হওয়ায় মুজিবনগর সরকার আমার ওপর ক্ষিপ্ত হলো। ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের কয়েকজন এলেন খোঁজ করতে। তাঁদের রুষ্ট হওয়ার কারণ, জামালের নিখোঁজ হওয়ার খবর নিয়ে তাঁরা পাকিস্তান সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছিল। আমার আবিষ্কৃত জামাল একটা মারাত্মক অভিযোগের হাত থেকে পাকিস্তানিদের রেহাই দিল। যুদ্ধ শেষে জামাল ফিরে কমিশন পেয়ে সেনাবাহিনীর সাধারণ লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে যোগ দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, স্বাধীন বাংলায় জামালের সঙ্গে অতঃপর আমার কদাচিৎ দেখা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর ত্রিরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্নটি ছিলেন শেখ কামাল। বঙ্গবন্ধুর জীবৎকালে কতিপয় কুৎসা রটনার বাইরে কামাল কদাচিৎ পরবর্তী কোনো ১৫ আগস্টে আলোচিত হয়েছেন। বস্তুত, শেখ কামালের প্রতি বাহাত্তরের প্রথম থেকেই একটি পরিকল্পিত অপপ্রচার শুরু হয়েছিল। তাঁকে ব্যাংক-লুটেরা বলে কলঙ্কিত করা ছিল একটি পরিকল্পিত প্রচারণা। সেই সুদূর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ছিলেন তাঁরা, পরবর্তীকালে যাঁরা তারেককে জিয়া ও খালেদার উত্তরাধিকারীর পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, হাওয়া ভবনকে ক্ষমতার তথা সরকারি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি বানিয়েছিলেন। কামালের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাঁরা শঙ্কিত ছিলেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে এই একটিমাত্র কারণেই, আমার মনে হয়, খুনিরা বঙ্গবন্ধুর অপর তিন বংশধরকে হত্যা করেছিল। অথচ আমি নিশ্চিত, বেঁচে থাকলেও রাজনীতিতে নিস্পৃহ কামাল রাজীব গান্ধী অথবা সঞ্জয় গান্ধী হতেন না। আল্লাহর কী অমোঘ বিধান, সেই ষড়যন্ত্রকারীদের অসদুদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে আজ কামালের বোন শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলায় গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও রাজনীতির ধারা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

যে ঘটনাকে 'ব্যাংক লুটের' অপচেষ্টা বলে রটনা করা হয়েছিল, বাস্তবে সেই ঘটনাপ্রবাহ ছিল ভিন্নতর। সে রাতে কতিপয় দুষ্কৃতকারীর ব্যাংক লুটের ষড়যন্ত্রের খবরটি কামাল আগেই জানতে পেরেছিলেন। তিনি সে রাতে তাঁর সদ্যগঠিত আবাহনী ক্রীড়া চক্রের ফকিরাপুলে অবস্থানকারী দুজন খেলোয়াড়ের মাধ্যমে আগাম খবরটি জেনেছিলেন। কামাল সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে মতিঝিল এলাকায় জিপে করে ছুটে যান আবাহনী মাঠের রাতের আলোচনা বৈঠক থেকে। তাঁর মাধ্যমে খবর পেয়েই ঢাকার পুলিশ সুপার বীর বিক্রম মাহবুবের পুলিশ বাহিনী লুটেরাদের ধাওয়া করে দুজনের পা গুলিবিদ্ধ করে। সেই রাতে আমি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সম্পাদক পদে সদ্য নিযুক্তি পেয়ে দৈনিক *মর্নিং নিউজ*-এ কাজ করছিলাম। মতিঝিলে গোলাগুলির শব্দ পেয়ে আমি একজন রিপোর্টার পাঠিয়েছিলাম। আশপাশের এলাকার লোকজনের কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনা জানার পর *মর্নিং নিউজ*-এ এ সম্পর্কে ছোট করে প্রকৃত

সংবাদও ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সবার জানা, ছাপানো সংবাদটিকে একটি কুৎসার নিচে চাপা দিয়েছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা।

একাত্তরে ফিরে যাই। ধানমন্ডি থেকে মুজিবনগরে হাজির হলেন কামাল। উদ্দেশ্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধে যাবেন। তাই সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওমসানী ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সংগত কারণে বঙ্গবন্ধুর বংশের প্রদীপকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন না। সমরাস্ত্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর মুজিবনগরে অবস্থানরত মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের এডিসি পদে নিয়োগ দিলেন তাঁকে। সেই অবস্থানে থাকার সময়ে আমি তাঁর সহযোগিতায় জেনারেল ওসমানীর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, যা বিবিসিতে প্রচারিত হয়েছিল। বস্তুত, তখনই কামালের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। যুদ্ধ শেষে কামাল দেশে ফিরলেন ভিন্ন এক ব্রত নিয়ে। বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যখন বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, কামাল তখন বাংলাদেশের প্রথম ব্যান্ড গায়ক দল গঠন করছেন। এসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে উদ্দাম অথচ কর্মহীন যুদ্ধফেরত যুবকদের সংগীত জগতের দিকে আকৃষ্ট করছিলেন তিনি। ক্ল্যারিওনেট, ফ্লুট, ড্রাম—নানা ধরনের গিটারের মতো বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তাঁর কায়কারবার! সব বাদ্যযন্ত্র চিনতামও না, সেই ব্যান্ড দলের উদ্দাম সংগীত শুনতে কামালের আমন্ত্রণে মাঝেমধ্যে আবাহনী মাঠের ছোট্ট টিনের ঘরটিতে যেতাম।

আগেই বলেছি, কামাল তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন, সদ্য স্বাধীন নিঃস্ব দেশে যুদ্ধফেরত তরুণদের সবার রাতারাতি কর্মসংস্থান করা যাবে না। আবার পুরোনো শিক্ষাঙ্গন বা কর্মস্থলের প্রতিও তারা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। তাই নানা কুকর্মে তাদের জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। আশঙ্কা আছে চাঁদাবাজি, ছিনতাই আর সন্ত্রাসে লিপ্ত হওয়ার। এসব ছাত্র-যুবককে পুরোনো বা সনাতন সাংস্কৃতিক জগৎও আর আকৃষ্ট করবে না। তাই তাদের তিনি নিয়ে এলেন পাশ্চাত্য সংগীতের নতুন ধারায়, নতুন প্রেরণায় তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন। গড়লেন বাংলাদেশের প্রথম ব্যান্ড দল।

অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অঙ্গন আর গানের সংস্কৃতিতে যারা আগ্রহী নয়, তাদের আকৃষ্ট করলেন খেলার জগতে। প্রতিষ্ঠা করলেন আবাহনী ক্রীড়া চক্র। সেই দলে যোগ দিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের কৃতী খেলোয়াড়দের অনেকেই। স্বাধীনতার আগেও আমাদের প্রধান ক্রীড়াকাণ্ড ফুটবলে এদের অনেকের অংশগ্রহণ ও সাংগঠনিক সংশ্লিষ্টতা ছিল। ফুটবল দল বলতে তখন আবাহনী, মোহামেডান, ওয়ান্ডারার্স, জিমখানা, ভিক্টোরিয়া, ওয়ারী ও রহমতগঞ্জ। তখনো খেলার মাঠে সামনের কাতারে আসেনি ব্রাদার্স ইউনিয়ন। আমি এ ক্লাবের ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলাম। সেই কারণে কামাল একদিন আমাকে অনুরোধ করলেন তাঁর নতুন ফুটবল দল গঠনে পরামর্শ দিতে ও সহায়তা করতে। আমি ব্রাদার্সের অবৈতনিক কোচ গফুর বালুচকে মাঝেমধ্যে আবাহনীর মাঠে নিয়ে আসতাম। ব্রাদার্সের মতো কলকাতা মোহামেডানের এককালীন খেলোয়াড় বালুচের আবাহনী গঠনেও অবদান রয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করছি, পরবর্তীকালে বালুচ যখন পাকিস্তানে চলে যেতে চাইলেন, তখন আমি জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁকে পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য একটি অনাপত্তিপত্র দিয়েছিলাম।

আবাহনী প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু যতই নামী-দামি খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত হোক না কেন, ইচ্ছা হলেই তখন যেকোনো দল প্রথম বিভাগে খেলতে পারত না। তৃতীয় বিভাগ থেকে জয় পেয়ে দ্বিতীয় স্তর পার হয়ে প্রথম বিভাগে আসতে হবে, তারপর লিগ চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু সমস্যা হলো তত দিনে আবাহনী ও সদ্য সুসংগঠিত ব্রাদার্স ইউনিয়নে অনেক নামী-দামি দর্শকনন্দিত খেলোয়াড় এসে গেছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে জাতীয় লিগ হয় কী করে? কামাল আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'কিছু করা যায় না?' আমি তখন স্বাধীনতা-পরবর্তী গঠিত জাতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি, গাজী গোলাম মোস্তফা সভাপতি, আর কামালেরই বন্ধু ও আবাহনীর একজন কর্মকর্তা, পরবর্তীকালে সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ সাধারণ সম্পাদক। অনেক চিন্তাভাবনা, গবেষণা, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনার রীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চালু করা হলো প্রিমিয়ার লিগ, সুপার লিগ,

আর নানা ধরনের দলীয় প্রতিযোগিতা। অতীতের অনুসরণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার লিগ খেলা, নক-আউট পদ্ধতিতে হারলেই বিদায় নেওয়ার কাপ-শিল্ডের জন্য প্রতিযোগিতার পুরোনো পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানো হলো। বলা বাহুল্য, আবাহনী প্রথম আবির্ভাবে এসব প্রতিযোগিতায় চমক দেখিয়েছিল।

শেখ কামালের রাজনীতিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাই আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক বা নির্বাচনী কার্যক্রমে তিনি কোনো দিন বিন্দুমাত্র অংশগ্রহণ করেননি। তবে শুধু একটি ব্যতিক্রম ঘটেছিল, যা আজও আমার জন্য একটি গর্বিত স্মৃতি হয়ে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু তিয়াত্তরের নির্বাচনে আমাকে অংশ নিতে নানা কারণে বাধ্য করলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি তো ৩০০ আসনে যাবেন না, তবে আমার এলাকায় যেতে হবে।' তিনি কী বুঝলেন জানি না, দুষ্টুমির মুচকি হেসে বললেন, 'আমি যাব না, তবে প্রতিনিধি একজনকে পাঠাব।' সেই একজন যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তহীন শেখ কামাল, তা জানলাম যখন একদিন সকালে কামালের টেলিফোন পেলাম, 'চাচা, আব্বার হুকুম, আপনার দেশের বাড়িতে যেতে হবে।' নির্ধারিত দিনে কামালকে ফেনী নিয়ে এলাম। সঙ্গে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে জাতীয় পার্টির (মঞ্জু) সাধারণ সম্পাদক শেখ শহীদুল ইসলাম। খোলা জিপে ফেনী থেকে বিলোনিয়া প্রায় কুড়ি মাইলের যাত্রাপথ। আমি জিপের চালকের আসনে, পাশে শেখ শহীদ আর ফেনীর ছাত্রলীগের নেতা রকিবউদ্দিন, পরবর্তীকালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি। হুড খোলা জিপে দাঁড়িয়ে শেখ কামাল।

জিপ চলেছে কুড়ি মাইল দূরের বিলোনিয়ার পথে। আগেই কেমন করে যেন খবরটি রটে গিয়েছিল। যাত্রাপথে রাস্তার দুই পাশে ছেলে-বুড়ো, শিশু কোলে নারী, ধানখেত থেকে উঠে আসা চাষি—সবাইকে দেখি। পথে কাকে কে যেন জিজ্ঞেস করলেন, 'এ্যাই বেগগুন এইচ্ছা দৌড়ার-কা? কোনাই যাস?' সবার মুখে একই কথা, 'শ্যাখের পোলারে দেখতে যাই।'

দীর্ঘ কুড়ি মাইল পথ কামাল শুধু মুগ্ধ জনতার সালাম নিলেন আর হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালেন। আসা-যাওয়ার পথে কোথাও থামেননি,

পথসভায় রাজনৈতিক ভাষণ দেননি, জনসভা করেননি, আমার জন্য নৌকা মার্কায় ভোট চাননি। নির্বাচন সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। সকাল নয়টায় ফেনী ছেড়ে চার ঘণ্টায় বিলোনিয়া। পরশুরামে আহারপর্ব শেষে একই পথে ফেনী, অতঃপর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। আমি গর্বিত ৩০০টি সংসদীয় আসনের এই একটিমাত্র নির্বাচনী এলাকায় কামাল এসেছিলেন বলে। এই একটিই রাজনৈতিক কর্মে অংশ নিয়েছিলেন শুধু আমার জন্য, মুজিব ভাইয়ের নির্দেশে।

ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রতিবেদন লিখেছিলাম একান্তভাবে কাছ থেকে দেখা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে। পরের বছর লেখার বিষয় ছিল মাতৃসমা, প্রেরণাদায়িনী, শক্তিদায়িনী, পরম পূজনীয়া মুজিবপত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেসা। অতঃপর জাতির স্মৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া অথবা প্রায় অনালোচিত অনন্য চরিত্রের তিন শিশু, কিশোর ও যুবককে ইতিহাসের অজানা পাতা থেকে তুলে আনলাম। হয়তো দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে বর্ণিত কাহিনিতে কিছু তথ্যবিচ্যুতি থাকতে পারে, তবে কোনো অতিরঞ্জন নেই। প্রতিবেদনে যদি আত্মপ্রচার কিছু থাকে, তা একান্তই প্রাসঙ্গিক।

মওলানা ও তাঁর মজিবর

প্রতিবছর অনাড়ম্বরভাবে ও অবহেলার সঙ্গে এই উপমহাদেশের একজন অগ্নিপুরুষের মৃত্যুদিবস পালিত হয়। বাস্তব হচ্ছে, দিনটি কবে কীভাবে কেটে গেল, কেউ জানতেও পারেন না। রাস্তা খুঁড়ে বাঁশ পুঁতে ব্যানার টানানো হয় না। কাঙালি ভোজনোৎসব হয় না। সেমিনার করে গুণকীর্তন করা হয় না। পল্টনে লাখো মানুষের জনসভায় তাঁকে স্মরণ করে কেঁদেকেটে বুক ভাসানো হয় না। একদিন যাঁর পদভারে এ দেশের মাটি কম্পিত হতো, যাঁর মুখে 'খামোশ' শব্দটি উচ্চারিত হলে ইসলামাবাদের মসনদ কেঁপে উঠত, সেই মওলানা ভাসানীকে এ দেশের মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাই, যখন আওয়ামী লীগ মওলানার জন্মদিন বা মৃত্যুদিবস পালনে শুধু নিস্পৃহতা নয়, তাচ্ছিল্যও দেখিয়ে থাকে।

মওলানা ভাসানী না হলে আওয়ামী লীগ হতো না, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ভারত থেকে পাকিস্তানে আসতেন না। বঙ্গবন্ধুর মতো একজন কালজয়ী নেতার নেতৃত্ব হতো না এ দেশের মুক্তিসংগ্রাম, হতো না স্বাধীনতাযুদ্ধ, 'বাংলাদেশ' নামের একটি দেশের জন্ম হতো না। তারও আগে গণভোটের মাধ্যমে সিলেট নামক জেলাটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হতো না, যদি ছেচল্লিশের গণভোটে মওলানা ভাসানী আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি না থাকতেন। এমনই অনেক কিছু হতো না, যদি না এই ক্ষণজন্মা পুরুষটির নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হতো। আজ শুধু

মুষ্টিমেয় দু-একটি প্রতিষ্ঠান নামেমাত্র তাঁর মৃত্যুদিবস পালন করে থাকে। তা-ও নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। এর মূলে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভুল ধারণা ও ভুল-বোঝাবুঝি। এমনকি তাঁর শেষ জীবনের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আমার মতো কারও কারও ক্ষোভ ও অভিমানের কারণেও। তিনি আজ অনেকের কাছেই অপাঙ্‌ক্তেয়।

বস্তুত, সারা জীবন এই মানুষটি বিতর্কিত থেকেছেন। তাঁর সব কাজ সব সময় সবাই বুঝে উঠতে পারেননি। মনে হয়, আজও তার রেশ রয়ে গেছে। পাকিস্তান সৃষ্টিতে অবদান রেখে ভারত খণ্ডিত করে নতুন দেশের জন্ম দেওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই এতৎসংশ্লিষ্ট মোহভঙ্গ ঘটে। সেদিন যখন নতুন দেশের জন্মের আনন্দ-আবেশে সবাই আচ্ছন্ন, মওলানা এগিয়ে এসেছিলেন জনগণকে বোঝাতে, কী অলীক ভিত্তির ওপর পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল! পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের সেই মোহ ভাঙতে অভূতপূর্ণ সাহস দেখিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। কতিপয় অনুসারী নিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। এর ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসেন কতিপয় তরুণ ও ছাত্রকে, যাদের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বারুদের মসলা। তাদেরই শীর্ষে ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁকে তিনি আদর করে ডাকতেন, 'মজিবর'। কথায় কথায় বলতেন 'আমার মজিবর' না থাকলে এটা হতো না, ওটা করতে পারতাম না।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগের তৃতীয় কাতারের নেতা। ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর পর আতাউর রহমান, কফিল উদ্দিন চৌধুরী ও আবদুস সালাম খান প্রমুখ। তার পরই শেখ মুজিব ও তাঁর সমসাময়িক তরুণের দল। কয়েক বছর পর সেই মজিবরকে তিনি সামনের কাতারে নিয়ে এসেছেন অন্য সবাইকে আড়াল করে। তাঁর মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের দাবদাহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।

একদিন মওলানা তাঁর সাধের আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে বামপন্থীদের নিয়ে গড়লেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। কোন

পরিস্থিতিতে কোন প্রেক্ষাপটে এই ভাঙন সম্পন্ন হয়েছিল, তা ভিন্ন আলোচ্য বিষয়। বামপন্থীরা কবজা করলেন ভাসানীকে। ভাবলেন, লুঙ্গি-টুপি পরা মওলানাকে সামনে রেখে তাঁরা এগিয়ে যাবেন। মওলানা তাঁদের হাতে ধরা দেননি। একের পর এক বামপন্থী নেতা তাঁর সৃষ্ট ন্যাপে এসেছেন, অবস্থা বুঝে আবার সরে পড়েছেন। তাঁরা ভাবতেন, এ আবার কেমন লোক, মুখে বলেন সমাজতন্ত্র, মার্ক্স আর লেনিনের কথা, আবার হাত দিয়ে মুরিদদের পানি পড়া আর তাবিজ দেন। বস্তুত, মওলানা সাহেব যাঁদের 'লাল মিয়া' বলতেন, তাঁরা তাঁকে ব্যবহার করেছেন, না তিনি তাঁদের কাজে লাগিয়েছেন, সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে মওলানা তাঁর ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের আসনে একে একে অনেককে বসিয়েছেন, আর কথায় কথায় আমাদের কাছে আফসোস করতেন, 'মজিবরের মতো কাউরে সেক্রেটারি পাইলাম না।'

মওলানার সেই মজিবর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হলেন। সারা দেশে তখন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে যখন ষড়যন্ত্র মামলার খবর প্রকাশিত হলো, সারা দেশে তখন এক ভীতিগ্রস্ত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, সর্বত্র থমথমে ভাব। আগে থেকেই বিভিন্ন মামলায় জেলে থাকা বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হলো। তাঁকে মামলার প্রধান আসামি করা হলো। জুনে শুরু হলো বিচার। সেদিন কোথাও কোনো প্রতিবাদী আন্দোলনের সাহস কেউ দেখাতে পারেননি। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অফিসার্স ক্লাবের ছোট্ট কামরায় আগরতলা মামলার শুনানি শুরু হলো। এদিকে আটষট্টির অক্টোবর-নভেম্বরে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠছে। প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানে, তারপর পূর্ব পাকিস্তানে। মাঠে নেমেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, নেতৃত্বে তোফায়েল, রব, মাখন ও অন্যরা। মিছিল ও সভা করছেন শ্রমিক-জনতা ঢাকার রাস্তায় আর পল্টন ময়দানে। জনতাকে নিয়ে সভা-মিছিল করছেন মওলানা ভাসানী। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন উঠল তুঙ্গে। কিন্তু আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির আন্দোলন তখনো প্রধান ইস্যু হয়নি। ক্যান্টনমেন্টের জেলে বসে শেখ মুজিবুর রহমান সব খবর

পাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন তখন শুধু একটিমাত্র লোকের কথা, যিনি এই আন্দোলন তথা গণ-অভ্যুত্থানকে দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন, তাঁকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে পারবেন।

ক্যান্টনমেন্টে অফিসার্স মেসে আগরতলা মামলা চলাকালে আসামিদের সঙ্গে বাইরের জগতের একমাত্র যোগাযোগ ছিল সাংবাদিকদের মাধ্যমে। ছোট্ট কামরায় আদালতে সাংবাদিকদের প্রথম টেবিলের প্রথম সারিতে যিনি বসতেন, তাঁর সঙ্গে আসামিদের বেঞ্চির প্রথম সারিতে প্রথম আসনে বসা শেখ সাহেবের দূরত্ব ছিল হাত ছোঁয়াছুঁয়ির নাগালে। সাংবাদিকদের প্রথম সারিতে সাধারণত বসতেন তৎকালীন *দৈনিক আজাদ*-এর প্রধান প্রতিবেদক বন্ধুবর ফয়েজ আহ্‌মদ। আদালতে মামলা চলছে, এরই মধ্যে শেখ সাহেব ফয়েজ আর তার কাছাকাছি বসা সাংবাদিকদের সঙ্গে রসিকতা করতেন, বাইরের পরিস্থিতির খবর আদান-প্রদান করতেন। একদিন ফয়েজ আহ্‌মদ অসুস্থ থাকায় *অবজারভার*-এর আতাউস সামাদ সেখানে বসেছেন। শেখ সাহেব একদিন বললেন, 'সামাদ, মওলানাকে গিয়ে বলো আমার মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে, বিশেষ কর্মসূচি দিতে।'

সামাদ অফিসে এসে আমাকে (*অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদক) বলল, 'আজকে রিপোর্ট ছোট হবে। আমাকে মওলানার কাছে যেতে হবে, শেখ সাহেবের ম্যাসেজ আছে।' সামাদ ও আমার আরেক রিপোর্টার আবদুর রহিম যোগাযোগ করল বামপন্থী শ্রমিকনেতা ও সাংবাদিক, পরবর্তীকালে এরশাদের মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খানের সঙ্গে। মওলানাকে নিয়ে যাওয়া হলো ইস্কাটনে, ঢাকায় এলে যেখানে তিনি থাকতেন, সেই সাঈদুল হাসান সাহেবের বাসায়। হাসান ভাইকে একাত্তরের মার্চে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে যায়, আর ফিরে আসেননি। মওলানাকে ম্যাসেজ দিল সামাদ অথবা রহিম, 'হুজুর, শেখ সাহেব জানিয়েছেন আপনাকে তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলনে যেতে হবে।' মওলানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আন্দোলন করব। তবে আইয়ুবের গোলটেবিলের পর।' আইয়ুব খান তখন রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছেন। মওলানা ও ভুট্টো সেই বৈঠক বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন। সামাদ বলল, 'হুজুর, শেখ সাহেব

আরেকটা কথা বলেছেন, তিনি এগারো বছর আপনার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। বলেছেন; "এ দেশে রাজনীতি করতে হলে তাঁর আমাকে প্রয়োজন হবে, আমারও তাঁকে নিয়ে রাজনীতি করতে হবে।"' মওলানা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'মজিবর এ কথা বলেছে? ঠিক আছে, তাকে মুক্ত করে ছাড়ব।' তার পরদিনই পল্টন ময়দানে মওলানা আঙুল তুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন লক্ষ জনতার সমাবেশে, সেই বিখ্যাত হুংকার, 'খামোশ'। মুজিব মুক্তির আন্দোলন জোরদার হলে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নতুন স্লোগান যোগ হলো, 'জেলের তালা ভাঙব/ শেখ মুজিবকে আনব'। শুরু হলো মওলানার সুখ্যাত বা কুখ্যাত সেই জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন। তাতে পুড়ল মন্ত্রীদের বাড়ি, আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি এস এ রহমানের বর্তমান বাংলা একাডেমীর পাশের কুঠিবাড়ি। তিনি রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যান। তার পরের ইতিহাস, আইয়ুবের গোলটেবিল, ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ ইত্যাদি সবারই জানা।

আগরতলা মামলা ভেস্তে গেল, মওলানা ভাসানীর মজিবর জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। এর পর থেকে মওলানা ও মজিবরের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ে। একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোয় অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত শেখ সাহেব মওলানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এ সময় প্রধানত দূতিয়ালি করতেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য টাঙ্গাইলের আবদুল মান্নান। অতঃপর সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। সেই সময়ে মওলানার ভারতে অবস্থান নিয়ে নানা রটনা হয়েছে, এ নিয়ে ভিন্ন আলোচনা হতে পারে। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা সাহেবের ভারতে অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা মওলানা সাহেবের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনি লিখেছেন, তাঁরা বোধ হয় জানেন না, তিনি চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের একক নেতৃত্বে পরিচালিত হোক। বিশেষ করে, মস্কোপন্থীদের কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ ও তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ও সজাগ ছিলেন। তিনি আরও চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে চীনের সমর্থন আদায় করতে। এ জন্য তিনি চীনে যাওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সরকারের আশঙ্কা ছিল, চীনে গেলে হয়তো

কম্বোডিয়ার নরোদম সিহানুকের মতো তিনি অন্তরীণ হয়ে যাবেন। অন্যদিকে মুজিবনগর সরকার মনে করত, ভারতে তাঁর উপস্থিতি ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এসব নিয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে, যার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া দুরূহ। এ নিয়ে 'হুজুর' আমাকে কিছু কথা বলেছিলেন, যার আলোচনা এখন অবান্তর।

মওলানা সম্পর্কে সবচেয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে। সেই সময়টুকুতে তাঁর ভারত-বিরোধী ভূমিকা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয় না। হয়তো তাঁর এ সময়কার সব কাজের উদ্দেশ্য ছিল পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা। বঙ্গবন্ধু তখন তাঁর ভূমিকা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। কারও কারও মতে, এই 'চাপ' সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর সায় ছিল, আমারও একটি অস্বচ্ছ ধারণা রয়েছে, যা প্রমাণসাপেক্ষ!

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পর বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারি বা মার্চে বঙ্গবন্ধু টাঙ্গাইল গিয়েছিলেন। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী দীর্ঘ নয় মাস দেশের অভ্যন্তরে থেকে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। সেই যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র বঙ্গবন্ধুর হাতে সেদিন তাঁর বাহিনী সমর্পণ করে। অনুষ্ঠানের পর বঙ্গবন্ধু মওলানার সঙ্গে দেখা করেন, দীর্ঘ সময় সেখানে অতিবাহিত করেন। আমাদের সামনে বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে মওলানা কেঁদে ফেললেন, 'মজিবর, তুমি বেঁচে এসেছ!' আমি তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক। সকালের দিকে আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষে মওলানার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। তবে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনাটি টেলিভিশনে কেন জানি ধারণ করতে দেওয়া হয়নি। আমার সঙ্গে ছিলেন সাংবাদিক এন এম হারুন। সেদিন সন্তোষের পাকিস্তানি বাহিনীর পুড়িয়ে দেওয়া ভিটিতে দাঁড়িয়ে মওলানা টিভি সাক্ষাৎকারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'মজিবরের বিপদ এখনো কাটেনি।' মওলানার সেই হুঁশিয়ারি, সেই উদ্বেগাকুল কণ্ঠস্বর এখনো আমার কানে বাজছে। মাত্র তিন বছর পরই মওলানার আশঙ্কাটি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী মওলানার সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের

সম্পর্কসংশ্লিষ্ট আরেকটি ঘটনা তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানিদের ছেড়ে যাওয়া নিঃস্ব দেশটিতে খাদ্যাভাব। মওলানা সাহেব পল্টনে সভা করে ভুখা মিছিল নিয়ে গণভবনে এলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর সরকারি বাসভবনের সামনে তাঁকে সসম্মানে ডেকে নিয়ে আদর করে খাবারদাবার দিয়ে আপ্যায়ন করলেন মন্ত্রী। উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরদিন সংবাদপত্রে সেই ছবি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হলো 'ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার পর মওলানার আহার-বিলাস'। এ ঘটনার সময় অসুস্থ বঙ্গবন্ধু লন্ডনে চিকিৎসা শেষে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্রামরত। ঘটনাক্রমে আমিও লন্ডনে গিয়েছিলাম সেখান থেকে *হলিডে*র সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খানসহ জেনেভায় বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যাই। জেনেভার ভিলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একান্ত আলাপকালে আমি ঘটনাটি বিবৃত করায় তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে আমাদের রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমানকে বললেন তখনই ঢাকায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বললেন, 'তারা পেয়েছে কী? কতটুকু জানে তারা মওলানা সম্পর্কে?' টেলিফোনে সৈয়দ নজরুলের সঙ্গে কথাবার্তায় বঙ্গবন্ধু কী বলেছিলেন, তা শোনার জন্য আমি সেই কামরায় অপেক্ষা করিনি।

আজ মওলানা ভাসানীর তথাকথিত অনুসারীরা বাকশাল গঠনের সমালোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু যখন তৎকালীন কতিপয় অতিবিপ্লবী রাজনৈতিক দলের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ও হঠকারিতায় দিশেহারা, সব দিক সামাল দিয়ে উঠতে পারছেন না, দেশি-বিদেশি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের খবরে অস্থির ও উদ্বিগ্ন, তখন তিনি মওলানার সঙ্গে দেখা করেছেন। আর কাউকে নয়, মওলানাকে ব্যাখ্যা করেছেন বাকশাল গঠনের পটভূমি। সঙ্গে গিয়েছেন তাঁর সামরিক সচিব শহীদ কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত মুন্সিগঞ্জের মহীউদ্দিন। জামিল সাহেব জীবিত নেই, মহীউদ্দিন নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আরও অনেক কিছু জানেন। তবে আমি নিশ্চিত মওলানা বাকশাল গঠন নিয়ে নিজস্ব মতামত ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই বাকশাল গঠনের পর মওলানা নিজেকে গুটিয়ে নেন, সন্তোষে স্বেচ্ছা-অন্তরীণ জীবন

যাপন করেন। পক্ষে-বিপক্ষে কোনো বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতেই সন্তোষে অবস্থান করছিলেন। আমার ধারণা, তাঁর এই স্বেচ্ছা-অন্তরীণ থাকাকে বন্দিজীবন বলে রটানো হয়। তাঁর নিরাপত্তায় নিযুক্ত পুলিশের অবস্থানকে এই বলে অপপ্রচার চালানো হয় যে, তারা তাঁকে আটক করে রেখেছে। অথচ মওলানার জন্য ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু প্রায়ই নিত্যপ্রয়োজনীয় সব দ্রব্য অর্থাৎ চাল-ডাল থেকে শুরু করে লুঙ্গি-টুপি-গামছা পর্যন্ত পাঠাতেন। বাহক ছিলেন টাঙ্গাইলের মন্ত্রী আবদুল মান্নান, কখনো-বা তাঁর একান্ত সচিব, পরবর্তীকালে মেয়র হানিফ।

মওলানা ও তাঁর মজিবরের মধ্যে ছিল এমনই এক আত্মার সম্পর্ক। আমি আজও ভেবে কূলকিনারা পাই না, সেই মজিবর সবংশে নির্মম ও নৃশংসভাবে শহীদ হলেন; অথচ মওলানার কোনো প্রতিক্রিয়া জানা গেল না কেন? তিনি কি সেদিন ব্যথিত হননি? চিরবিদ্রোহী মওলানা কেন এ রকম একটি জঘন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব প্রতিক্রিয়া জানাননি? এ নিয়ে অনেক ক্ষোভ, অনেক ক্রোধ ও অনেক অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে আমার মতো অনেকেরই। সত্যিই কি তিনি সেদিন নিশ্চুপ ছিলেন, কিন্তু কেন? পরবর্তীকালে কোনো একদিন তৎকালীন এনএসআই অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার প্রধান এ বি এস সফদার আমাকে জানিয়েছিলেন, মওলানা একটি প্রতিক্রিয়া বা বক্তব্য দিয়েছিলেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে, তখনকার বদ্ধ পরিস্থিতিতে মোশতাক সরকার তা প্রচারিত হতে দেয়নি। আরও প্রশ্ন আছে, আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেন অথচ জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা দখলের সমালোচনায় তিনি সোচ্চার হলেন না কেন? অনেকের মতে, তিনি বরং পরোক্ষ সমর্থনই দিয়েছেন জিয়ার সরকারকে। এ রহস্যের কোনো সমাধান আজও আমি করতে পারিনি। এটা আমার কাছে বেদনাময় স্মৃতি হয়ে রয়েছে, বুকে কাঁটার মতো বিঁধছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জ্বলন্ত মশালের শিখা ম্লান হয়ে গেল কেন? ১৫ আগস্টের পর দেশত্যাগী হয়েছিলাম, তাই এসব প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে জানতে পারিনি। তাই জীবদ্দশায় যেমন, মৃত্যুর পরও মওলানা বিতর্কিত রয়ে গেলেন।

তবু শত বিতর্ক, হাজারো অভিযোগ, অভিমান ও ক্ষোভ থাকলেও

তিন দশক ধরে এ দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা এবং স্বাধীন বাংলার জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানের বঙ্গবন্ধু ও জাতির জনকে পরিণত হওয়ার পটভূমিতে মওলানা ভাসানীর অবদান অস্বীকার করতে পারবেন না, আওয়ামী লীগ তো নয়ই।
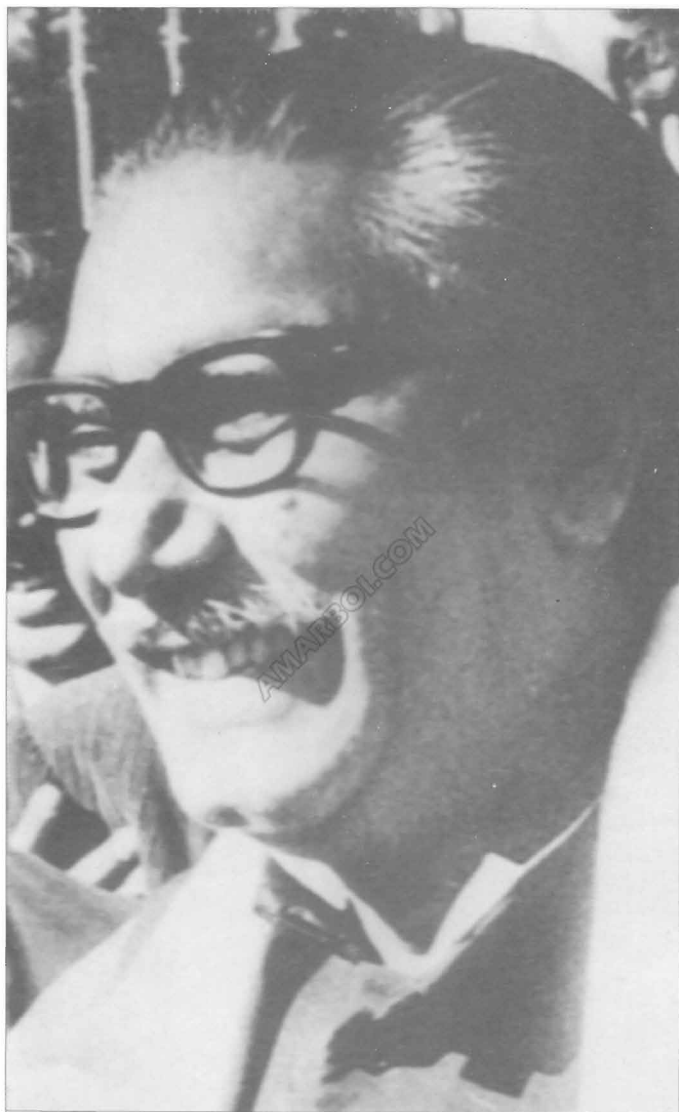
অন্তরঙ্গ হাসিতে মুজিব ভাই

মা-বাবার সঙ্গে মুজিব ভাই

সপরিবারে মুজিব ভাই

মুজিব ভাই ও ভাবি ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

১৯৫৩ সালে আরমানিটোলা মাঠে জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন মুজিব ভাই

১৯৫৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শিল্পমন্ত্রী মুজিব ভাই

১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার পথে

১৯৬৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকে মুজিব ভাই

১৯৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন মুজিব ভাই

১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি মুজিব ভাই বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানে যাচ্ছেন
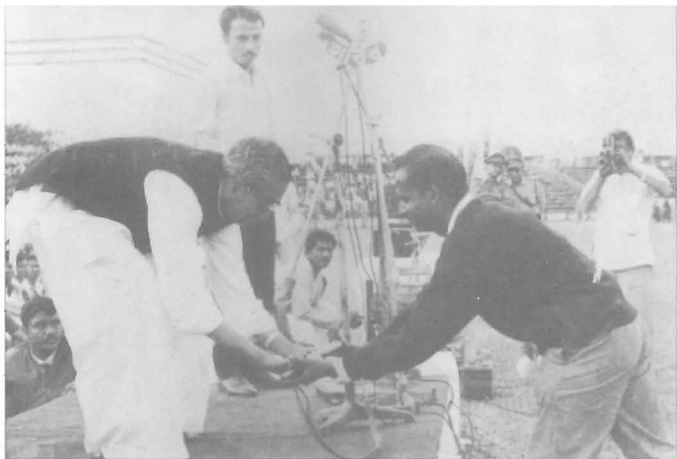
মুজিব ভাইয়ের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ

বাংলাদেশ সফর শেষে মুজিব ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী

মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে লেখক

গাফ্‌ফার, ফয়েজ ও আমি। মুজিব ভাইয়ের ভাষায় 'আপদ', 'বিপদ' আর 'মুসিবত'

সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা

ইতিহাসের তিনজন মহানায়কের তিনটি ভাষণের মধ্যে আমি অপূর্ব মিল দেখতে পাই—মার্কিন গণতন্ত্রের পথনির্দেশক আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণ, ব্রিটিশ জাতির সংকটকালের উইনস্টন চার্চিলের যুদ্ধকালীন একটি বেতার ভাষণ এবং বাঙালি জাতির মুক্তির নির্দেশনা দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের সাতই মার্চের উদাত্ত আহ্বান। লিংকন তাঁর ভাষণটি দিয়েছিলেন গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত আমেরিকানদের জাতি গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়ে; চার্চিল ব্রিটিশদের জার্মান ফ্যাসিস্ট শক্তিকে প্রতিহত করতে উদ্দীপ্ত করেছিলেন; আর বাঙালি জাতির নেতা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য।

আব্রাহাম লিংকন মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পথনির্দেশক বলে পরিচিত। প্রায় ১০০ বছর পর আমেরিকা এ রকম আরেকজন মাত্র প্রেসিডেন্টকে পেয়েছিল, যাঁকে বিশ্ববাসী আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, তিনি হচ্ছেন জন এফ কেনেডি। লিংকন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তিটি করে গেছেন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করে—গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল—অর্থাৎ জনগণের জন্য জনগণ পরিচালিত জনগণের সরকার। তবে তাঁর ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর গেটিসবার্গে প্রদত্ত ভাষণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা, একটি নতুন জাতিসত্তা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি বলেছিলেন 'এ নিউ নেশন', একটি নতুন জাতির কথা, যে জাতি সব মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে মুক্তির মূলমন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

বলেছিলেন 'এ নিউ বার্থ অব ফ্রিডম'-এর কথা। সেদিন তাঁর এই আহ্বান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি রচনার সহায়ক।

স্যার উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কট্টর সমর্থক ছিলেন, যিনি বলেছিলেন, 'ওভার মাই ডেড বডি', অর্থাৎ, 'আমার লাশের ওপর ভারত স্বাধীনতা পাবে।' কিন্তু নিজের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁর সেদিনকার নেতৃত্ব ছিল অনবদ্য ও অসামান্য। হিটলারের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তিনি দেশবাসীকে এই বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করব।' বিবিসি থেকে ১৯৪০ সালের ৪ জুন তিনি তাঁর ভাষণে দেশবাসীকে দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচ, অন্য দ্য ল্যান্ড, ইন দি স্কাই, অ্যান্ড ওশেনস,' অর্থাৎ জলে, স্থলে, সমুদ্রে, সৈকতে আমরা যুদ্ধ করব। 'হোয়াটএভার মে বি দ্য কস্ট, যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করব, আমরা আত্মসমর্পণ করব না।'

কী অদ্ভুত মিল রয়েছে এই দুটি ভাষণের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের। তবে রেসকোর্স ময়দানের ভাষণটি ছিল আমার মতে আরও অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী, অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভাষার মাধুর্য ও বাক্যবিন্যাসের বিচারে অনেক মধুর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, স্বল্প কথায় অনেক কিছু বলেছেন। আজ সেই ভাষণের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ভাষণটির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি চরণ নিয়ে একটি আলাদা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কেন এই ভাষণটিকে ঐতিহাসিক বলা হবে, এই উপমহাদেশের ইতিহাস কীভাবে পাল্টে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান। উনসত্তরের উত্তাল মিছিলের স্লোগানের 'আমার নেতা, তোমার নেতা—শেখ মুজিবর শেখ মুজিব'কে' কী রূপে দেখেছি একাত্তরের সাতই মার্চ? কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে সাতই মার্চের ভাষণ? স্বাধীনতার ঘোষণা, প্রতিরোধের আহ্বান, মুক্তির পথনির্দেশনা? কারও কারও মতে, ২৬ মার্চ নয়, সেদিন রেসকোর্স ময়দান থেকেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এর পক্ষে প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয় সেই দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এই যে সংগ্রামের কথা বললেন, তার মানে কী, তা-ই আগে বিশ্লেষণ করা দরকার। সংগ্রাম বলতে আমরা বরাবর বুঝে এসেছি অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই, আন্দোলন, সভা-শোভাযাত্রা, এমনকি হরতাল ও অসহযোগ। আবার সংগ্রামের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'যুদ্ধ'। সংগ্রাম বলতে একসময় সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কথাও বোঝাত। জনতার শেখ সাব যে সংগ্রামের কথা বলেছেন, তা কি আন্দোলন, বিদ্রোহ-বিপ্লব, স্বাধীনতার ঘোষণা? সম্প্রতি কোনো কোনো মহল থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে, তার জবাবে অতি সহজ ভাষায় বলা যায়, সাতই মার্চের ভাষণ শুধু একটি ঘোষণা নয়, ছিল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা। বেতারে দুই লাইনের প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স নয়, ডিক্লেয়ারেশন অব ওয়ার। রেসকোর্সের ভাষণ ছিল অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের আহ্বান। সমগ্র বক্তব্য যদি পুরোপুরি একসঙ্গে পড়া হয়, তাহলে কথাটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। সংগ্রামের ডাক দেওয়ার আগে তাঁর দুটি বক্তব্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।' আর বলেছিলেন, 'তোমাদের যার যা আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো।' স্বভাবতই প্রশ্ন করা উচিত, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কেন? দ্বিতীয়ত, কেন শত্রুর মোকাবিলা করতে বলা হয়েছে? এর মানে হচ্ছে, যুদ্ধ শুরু হলে এ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শত্রু বলতে নিশ্চয়ই একটি প্রতিপক্ষের কথা বলা হয়েছিল, সেই প্রতিপক্ষ কোত্থেকে এল যদি যুদ্ধই না বাধে? সোজা কথায় তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। সেই ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান নিয়ে এখন 'ঘোষকের' তকমা নিয়ে বিতর্ক চলছে।

এ কারণেই আমার বিশ্লেষণ হচ্ছে, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন, যে যুদ্ধ ছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য। ভাষণটির আরেকটি ব্যতিক্রম হচ্ছে, অতীতের ভাষণগুলো থেকে এর উপস্থাপনা ছিল ভিন্নতর। যাঁরা ভাষণটি শুনেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মনঃসংযোগ করলে বুঝতে পারবেন, অতি ধীরেসুস্থে বক্তব্য শুরু করে তিনি একসময় চরমে পৌঁছেছেন, ক্লাইমেক্সে গিয়ে বলেছেন, 'এই দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' তার আগে অনেক কথায় তিনি একটি ইতিহাস বিবৃত করেছেন, বিদ্যমান রাজনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর প্রস্তুতির

কথা বলেছেন। সবশেষে একটি আহ্বান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছেন। মাঝে আছে পথনির্দেশনা, ভবিষ্যতের কর্মসূচি। 'যদি আমি হুকুম দিবার নাও পারি', তখন কী করতে হবে, তা-ও বলেছেন, অর্থাৎ সেনাপতি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা গ্রেপ্তার হন, তাহলে কী করতে হবে, তা-ও বলে দিয়েছেন। উইনস্টন চার্চিলের মাঠে-ঘাটে-সমুদ্রতীরে যুদ্ধ করার মতো করে বলেছেন, 'ভাতে মারব, পানিতে মারব।' তাই সাতই মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার ডাক নয়, কোনো ঘোষকের ঘোষণা নয়, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের নির্দেশনা। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, তিনি সরাসরি বললেন না কেন যে সেদিন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন? এ প্রশ্ন সেদিনও উঠেছিল। পরেও উঠেছে।

ভাষণটি দেওয়ার আগেও অনেক আলোচনা, বিতর্ক হয়েছে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু কী বলবেন, এসব নিয়ে। ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশন বাতিল ঘোষণার পর যখন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানেই যা বলার বলব, তখনো সবাই এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছেন। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক, সেখানকার রাজনৈতিক নেতারাও ধরে নিয়েছিলেন, হয়তো একটি যুগান্তকারী দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেওয়া হবে রেসকোর্স ময়দানে। পাঁচ লাখ নর-নারী সেদিন উল্লাস করে, শোভাযাত্রা করে, নেচে-গেয়ে ময়দানে হাজির হয়েছিলেন একটিমাত্র কথা শোনার জন্য, সে কথাটি ছিল, 'স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করো।' এমনকি সভা শুরু হওয়ার পূর্বলগ্ন পর্যন্ত, বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করার পূর্বমুহূর্তেও এ নিয়ে ছিল চাপা উত্তেজনা। তদুপরি তিনি সভাস্থলে আসতে দেরি করছিলেন, ৩২ নম্বরে বসে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন, জঙ্গি নেতারা সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছেন—এসব খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বঙ্গবন্ধু এলেন, পাঁচ লাখ জনতার দিকে তাকালেন, তাঁদের মনের খবর কি তাঁর অজানা ছিল? তাঁদের চাহিদা ও মনোবাসনা কি তিনি অনুধাবন করতে পারেননি? পেরেছিলেন। আবার এ খবরও তিনি রাখতেন, তাঁর সেদিনের বক্তব্য পাকিস্তানের ইতিহাস শুধু পাল্টে দেবে না, পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কী বললে কী হবে, পাকিস্তানিরা সেই মুহূর্তে কী করবে, তা-ও অনুমান করেছিলেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাঙালি নেতারা তাঁকে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করছিলেন।

শুধু সুদূরপ্রসারী নয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথাও তিনি স্মরণে রেখেছিলেন। তারপর তিনি ধীরলয়ে শুরু করলেন ভাষণ। স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে তাঁর ভাষণ এগিয়ে চলল, স্বরের উত্থানপতন হতে লাগল। সেদিন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যে পাঁচ লাখ মানুষ সেই ভাষণ শুনেছিলেন, তাঁরা সেই নাটকীয় পরিস্থিতি স্মরণ করতে পারেন। তাঁর বক্তব্য অতীত থেকে বর্তমানে এল, তারপর ভবিষ্যতের দৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা, 'জয় বাংলা'।

সেদিন রেসকোর্স ময়দান থেকে যাঁরা ফিরে গেলেন, তাঁদের কারও কারও মধ্যে কি একটু হতাশাও ছিল না? ছিল বৈকি, কারণ তাঁরা একটি সুনির্দিষ্ট আওয়াজ—এখনই স্বাধীনতা, এই মুহূর্তে পূর্ণ মুক্তি চাই—কথাগুলো শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেননি বঙ্গবন্ধু এই স্বাধীনতাকে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার মনে করেননি। এই দেওয়া-নেওয়ার তথাকথিত অর্জিত স্বাধীনতা ছিল 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্র। সেই 'স্বাধীনতা' অর্জিত হয়েছিল ভ্রাতৃহন্তা আর বোঝাপড়ার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন, তথাকথিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে আমরা বছর খানেকের মধ্যে বুঝেছিলাম, লেনদেনের এই পরিণতি শেষ পর্যন্ত সুখের হয়নি। তা ছাড়া ৭ মার্চের আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন, যেদিন ঘরে ঘরে সবুজ জমিনে বাংলাদেশের মানচিত্র-খচিত পতাকা উড়ছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রায় এক মাস ধরে সরকার চলছিল, অফিস-আদালত, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা চলছিল। তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতিতে সাতই মার্চের ভাষণে রক্তের বিনিময়ে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব।' এই রক্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, মার্চের প্রথম থেকেই যে স্বাধীনতা কায়েম হয়েছিল, তা স্থায়ী করার জন্য। দেশকে মুক্ত করতে নয়, আসলে মুক্ত রাখতেই সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চের কালরাত থেকে। ২৫ মার্চের রাতে আমাদের স্বাধীনতার ওপরই হামলা হয়েছিল। সাতই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই যুদ্ধেরই আগাম ডাক দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাই সাতই মার্চের ভাষণ পড়তে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে আবেগ দিয়ে নয়। একাত্তরের ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধি করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা এবং একটি সংশ্লিষ্ট কাহিনি

একটি জাতি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করল, অথচ সেই যুদ্ধের যিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, সুপ্রিম কমান্ডার অব দি আর্মড ফোর্সেস, তিনি অনুপস্থিত। কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকে তিনি শুধু অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। এমনটি শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটেনি, আরও অনেক দেশের জনগণের পরাধীনতা, ঔপনিবেশিকতা ও স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি ঘটেছে তাদের মহানায়কের দূরে অবস্থান সত্ত্বেও। লেনিন বসে ছিলেন সুদূর জার্মানিতে, রাশিয়া জার শাসনমুক্ত হলো। নেলসন ম্যান্ডেলা একটি নির্জন দ্বীপে বন্দী, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতশাসনের অবসান ঘটাল তাঁর অনুসারীরা। জেমো কেনিয়াত্তা দূর থেকে কেনিয়ার ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন। নরোদম সিহানুক চীনে বসে পরিচালনা করেছেন কাম্পুচিয়া তথা কম্পোডিয়ায় মার্কিনবিরোধী যুদ্ধ। ইরানের শাহের পতন ঘটিয়েছিলেন খোমেনির অনুসারীরা, যিনি স্বয়ং তখন প্যারিসে বাস করছিলেন। তাঁর ক্যাসেটে বদ্ধ বাণী শুধু ইরানের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। একইভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি সম্বল করে বাঙালি যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করল। একটি মুজিবের কণ্ঠ লক্ষ মুজিবের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিস্তৃত রণক্ষেত্র আর অবরুদ্ধ বাংলাদেশ জুড়ে।

তবে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। রাশিয়ানরা জানত লেনিন ফিরবেন। কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানরা ম্যান্ডেলার জীবনহানি নিয়ে শঙ্কিত ছিল না। সিহানুক চীনে নিশ্চিত ও আয়েশি জীবন যাপন করছিলেন। প্যারিসে খোমেনি

নিরাপদে ছিলেন। অন্যদিকে শেখ মুজিব পাকিস্তানি জেলে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। তাঁর দেশবাসী জানত না তিনি বেঁচে আছেন কি না, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ফিরে আসবেন কি না। অন্য যাঁদের কথা বললাম, তাঁদের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা ছিল না। সুতরাং, তাঁরা ফিরে আসার পর মুক্ত দেশ কীভাবে শাসিত হবে, তা নিয়ে ভাবনা ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিব যদি স্বাধীন বাংলায় না ফিরতেন, তাহলে কী হতো দেশটির?

কথাটি দুইভাবে বলা যায়। এক. বঙ্গবন্ধু যদি ফিরে না আসতেন। দুই. বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন বলে অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছে, আবার অনেক ঘটনা ঘটতে পারেনি। প্রথম বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, লিখেছেন এবং বিশ্বাসও করেন যে বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে প্রথমত বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এত তাড়াতাড়ি যেত না। তারা চাইলেও যেতে দেওয়া হতো না। কারও মতে, মুজিববাহিনী আর মুজিবনগর ফেরত প্রবাসী সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করত, দেশে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। কঙ্গো, সোমালিয়া বা আফগানিস্তানের মতো গোষ্ঠীগত না হলেও দলগত সংঘর্ষ লেগে থাকত। সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো সামর্থ্য দেশে আসা প্রবাসী সরকারের ছিল না। এমনকি সরকারের মধ্যে 'অন্তর্দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল', দেশ শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় মনোবল বা প্রভাব প্রতিষ্ঠার ক্ষমতার অভাব ছিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, বাহাত্তরেই তেমন কিছু ঘটতে পারত। বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে কী যে হতো, তৎকালীন দেশের অবস্থা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের ছাড়া অন্য কাউকে তা বোঝানো যাবে না। সহজ কথায় বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে অনেক কিছুই হতো, অনেক অঘটন ঘটত, যা রোধ করার ক্ষমতা অন্য কারোর ছিল না। মুজিবনগর সরকারের চারদিকে সুরক্ষা বন্ধন তৈরির জন্য ভারতীয় বাহিনীকে পাহারায় থাকতে হতো। এখন নতুন বাংলাদেশ ইরাক অথবা আফগানিস্তানও হতে পারত। ভারতীয় বাহিনী মোতায়েন থাকলেও বিদ্যমান অরাজক পরিস্থিতি সামাল দিতে পারত না। হয়তো সেই পরিস্থিতির অজুহাতে তারা থেকেই যেত অথবা তাদের থাকতে বলা হতো। বলা বাহুল্য, এসবই আমার পর্যবেক্ষণ, কোনো নির্দিষ্ট মতামত অথবা পরিস্থিতি-উত্তর গবেষণা নয়।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন বলে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশকারী রাজাকার-আলবদররা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল আত্মগোপন করে, পালিয়ে বেঁচেছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে, ঘাপটি মেরে বসেছিল পঁচাত্তরের অঘটনটি ঘটানোর জন্য। অভিজ্ঞ ও ঝানু রাজনীতিবিদ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু কি তা বুঝতে পেরেছিলেন?

উপরিউক্ত যাবতীয় আলোচনা হচ্ছে একটি মূল বক্তব্যের পটভূমি। এ কথা তাদের অনেকে স্বীকার করে, প্রকাশ্যে না হলেও অন্তত ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তো বটেই। তিনি ফিরে এসেছিলেন বলেই স্বাধীনতাবিরোধীরা সাধারণ ক্ষমা পেয়েছিল। এটা কি তাঁর রাজনৈতিক কোনো পদক্ষেপ, হৃদয়ের মাহাত্ম্য অথবা বদান্যতা? এ নিয়ে কেউ কেউ এখনো তির্যক মন্তব্য করে, এমনকি তাঁর আগমনে যারা বেঁচে গিয়েছিল, তারা চরম কৃতঘ্নের মতো তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখায়। বঙ্গবন্ধুর জীবন, কীর্তি, চরিত্রের বিভিন্ন দিক, সবশেষে তাঁর সরকার পরিচালনা ও দেশ শাসন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিতর্ক হয়েছে, তাঁর চরিত্রহনন ঘটেছে। আবার তাঁকে সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে দেবতা বা অতিমানব বানানোর প্রচেষ্টা হয়েছে। অথচ বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের একটি মহান দিকের ওতপ্রোত সম্পর্ক নিয়ে কেউ আলোচনা করেননি। একজন সফল সংগঠক, একজন শক্তিমান জননেতা, অগণিত মানুষ আবেগ ও ভালোবাসা যাকে উজাড় করে দিয়েছে, সেই ব্যক্তিটির চরিত্রের মহান দিকটি নিয়ে আলোচনা হয়নি। অনুজ সাংবাদিক প্রয়াত শফিকুল আজিজ মুকুল দুঃখ করে একবার বলেছিলেন, এত শক্তিশালী আওয়ামী লেখকগোষ্ঠী, এত বঙ্গবন্ধু-প্রেমিক সাহিত্যিক-সাংবাদিক, কেউ তো তাঁর চরিত্র ও জীবন পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে আজও একটি বই, একটি পুস্তিকাও লেখেননি। তাঁর জীবন ঘিরে কত কিংবদন্তি, কত অন্তরঙ্গ কাহিনি রয়েছে, কেউ তা সংগ্রহ করেননি। তিনি নিজেও আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণামূলক কোনো লেখা লিখে যাননি। অবশ্য অতি সম্প্রতি তাঁর একটি অসমাপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে পূর্ণাঙ্গ মুজিবকে পাওয়া যায় না।

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এমনই

একটি অন্তরঙ্গ কাহিনি বর্ণনা করার জন্য ১৯৭২ সালে তাঁর ফিরে আসা না-আসা নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করলাম, যা হয়তো ভিন্ন কোনো প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু হতে পারত। মুজিব ভাই চরিত্রের সবচেয়ে মাধুর্যপূর্ণ দিকটি ছিল প্রতিটি পরিচিত মানুষ, যে-ই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে, তার জন্য ছিল তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা। তাঁর বাঙালি চরিত্র এবং দলের কর্মীদের সঙ্গে তাঁর আপন সম্পর্ক ও মধুর আচার-আচরণের সম্পূরক বলা যেতে পারে এই আন্তরিকতার প্রকাশগুলোকে। সেই আন্তরিকতা আর ব্যক্তিগত নিবিড়তার ছোঁয়া পেয়েছিল শত্রু-মিত্র নির্বিচারে সবাই। তবে তাদের মধ্যে সাংবাদিকেরা একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে ছিলেন।

স্নেহভাজন তৎকালীন দিল্লিস্থ বাংলাদেশের সংবাদদাতা আতাউস সামাদ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সেই দিনটিতে লন্ডন থেকে ফেরার উড়োজাহাজে দিল্লি হয়ে ঢাকা এসেছিল। ঢাকায় এসে সামাদ বলেছিল, প্লেনে বসে বঙ্গবন্ধু সবার আগে, এমনকি আপন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রাজনৈতিক সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠজনদের নয়, খোঁজ নিয়েছেন তাঁর পরিচিত ও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা সাংবাদিকদের। নাম ধরে প্রতিজনের খোঁজ করেছেন। বারবার শুধু জিজ্ঞেস করেছেন, বেঁচে আছে তাঁদের সবাই? যাঁদের খোঁজ করেছেন, যাঁদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তাঁরা যে সবাই পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তাঁর সঙ্গে সব সময় মৈত্রীসুলভ আচরণ করেছেন, তা তো নয়। তাঁর চরিত্র হনন করেছেন অনেকে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, নীতি-আদর্শের সমালোচনার বাইরেও তাঁর সম্পর্কে কখনো কখনো কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য বেরিয়ে এসেছে তাঁদের কারও কারও লেখনী তথা টাইপরাইটার থেকে। অতীতের কতিপয় বিদ্বেষী ও কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিগত ভূমিকার কারণে বাহাত্তরে তাঁদের অবস্থা কী হতে পারে, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা অনুমান করা দুরূহ ছিল না। তাই উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছেন কেমন আছেন তাঁরা। *মর্নিং নিউজ* আর *পাসবান*-এর বাঙালি সাংবাদিকেরা? জানতে চেয়েছেন কোথায় মর্নিং-নিউজের বদরুদ্দিন, *জং*-এর নাদভি, *পাসবান*-এর দেশনভি আর *মর্নিং নিউজ*-এর এস জি এস বদরুদ্দিন।

জানতে চেয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক বৈরীদের ভাগ্য, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁদের জন্য। তাঁদের কারও সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর শত বৈরিতা সত্ত্বেও

ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্কের অনেক জানা-অজানা কাহিনি অনেকেরই রয়েছে? আইয়ুবের কনভেশন মুসলিম লীগের শাহ আজিজ পাকিস্তানের দালালির অভিযোগে বঙ্গবন্ধু ফেরার আগেই জেলে গিয়েছেন। গণহত্যার দায়ে ফরিদ আহমদ জনতার রোষে শিকার। দেশে ফেরার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তাঁর এই জেলবন্দী পুরোনো বন্ধুর পরিবারকে দেখভাল করেছেন। ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে চিরকালের রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা ছিল, ব্যক্তিগত বৈরিতা ছিল না, শত্রুতা ছিল না। ১৯৭৩ সালে জেলে তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত বঙ্গবন্ধু তাঁর শোকার্ত ছেলে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এমনই আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এমনই আরও অনেক কাহিনি জেনেছি, নিজে ঘটতে দেখেছি। অথচ বঙ্গবন্ধু যে এদের নিষ্ঠুর গণহত্যার ভূমিকা মানেননি, তা নয়।

আপাতত রাজনৈতিক মহল ও প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্প্রীতিময় মধুর সম্পর্কের আলোচনা স্থগিত রাখলাম। কারণ তখনকার বিদ্যমান অবস্থার বিপাকে তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কিছুই করার ছিল না। ক্ষিপ্ত, প্রতিশোধস্পৃহায় মাতোয়ারা জনতার ক্রোধ ও প্রতিহিংসা গ্রহণে উন্মত্ত শহরে-গ্রামে-গঞ্জে ছড়ানো লক্ষ-কোটি বৃদ্ধা-পৌঢ়-যুবক নরনারীকে সামলানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ করেছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত একটি সংবেদনশীলতার শুধু একটি কাহিনি বলব, যার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ফেরার অথবা ফিরে না আসার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

কাহিনির যবনিকার উত্তোলন বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার দুই দিন পর। বঙ্গবন্ধু একদিন পুরোনো গণভবনে আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ রে, সবাইকে দেখলাম, বদরুদ্দিন ভাই কোথায়?' বদরুদ্দিন মানে, তৎকালীন পাকিস্তানি মালিকানার ট্রাস্টের পত্রিকা *মর্নিং নিউজ*-এর সম্পাদক। পত্রিকাটি অহর্নিশ তাঁর কুৎসা গেয়েছে, আগরতলা মামলার সময় তাঁর ফাঁসি দাবি করেছে। এই সেই পত্রিকা, যার অফিস বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় জনগণ পুড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে অহর্নিশ বিষোদ্‌গারকারী সেই পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কমতি ছিল না। তাঁর নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বললেন,

'কোথায় আছেন বদরুদ্দিন ভাই? খুঁজে নিয়ে আয়। ভালো আছেন তো? কোনো অসুবিধায় নেই তো?'

বঙ্গবন্ধুর আদেশে বদরুদ্দিনকে খুঁজতে লাগলাম। পেয়েও গেলাম, লালমাটিয়ার একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন তিনি। বহু কোশেশ করে দেখা করলাম। বললাম; 'মুজিব ভাই আপনাকে খুঁজছেন। চলুন আমার সঙ্গে।' বদরুদ্দিন ভাইয়ের চোখমুখ যেন ঝলসে উঠল, 'ক্যায়া, শেখ সাব মুঝে বোলায়া, আই ক্যান গো টু হিম, সি হিম?' নিয়ে এলাম তাঁকে গণভবনে, যেন দুই বৈরী নয়, যেন দুই বন্ধুর মিলন দেখলাম। বুকে জড়িয়ে ধরলেন, পাশে বসালেন। নেতা জিজ্ঞেস করলেন, 'হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? আপনি কী করতে চান? কাঁহা যাতে চাহেঁ? কোন বিপদে নেই তো?' আবেগময় প্রশ্নগুলো শুনে বদরুদ্দিন আধো কান্না আধো খুশি মেশানো কণ্ঠে বললেন, 'পাকিস্তানে যেতে চাই, মে আই লিভ ফর করাচি?' বঙ্গবন্ধু একান্ত সচিব রফিকউল্লাহকে ডাকলেন, 'বদরুদ্দিন ভাই যা চান, তা-ই করে দাও।' উল্লেখ করা প্রয়োজন পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ভারতের সঙ্গেও নৌ-স্থল-বিমান যোগাযোগ নেই। কিছু অবাঙালি গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত ও কাঠমান্ডু হয়ে তারপর পাকিস্তানে যাচ্ছেন।

তার পরের কাহিনি সংক্ষিপ্তভাবে বলা যাক। বদরুদ্দিন ভাইয়ের আরেকটি প্রার্থনা, আসাদ অ্যাভিনিউয়ের বাড়িটি বিক্রি করবেন, সেই টাকাও তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাহাত্তরে সেই সময়ে একজন বিহারির এহেন একটি আবদার কেউ কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বললেন, তথাস্তু, তা-ই হবে।

আবার আমার কাঁধে চাপালেন এই অসম্ভব কাজটি সমাধান করার দায়িত্ব। বিহারিদের পরিত্যক্ত বাড়ি বিক্রি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিশেষ অনুমতি দিলেন একটি আউট অব দ্য ওয়ে, বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়ে। ক্রেতা ঠিক হলো আতাউদ্দিন খান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরশাদের সামরিক শাসনামলে আতা খান বাড়িটি ক্রয়ে দুর্নীতি করেছেন বলে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সামরিক আদালত থেকে তাঁকে খালাসের জন্য সাক্ষী-সাবুদ জোগাড়ে আমাকে একই ধরনের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। যা-

ই হোক, শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা হলো। বঙ্গবন্ধুর সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরীর সহায়তায় সচিব আতা সাহেব বাড়ি কিনে যে টাকা দিয়েছিলেন, তা বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তরিত করে বাইরে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর (বর্তমানে প্রয়াত) হামিদুল্লাহ সাহেবকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর বদরুদ্দিন স্বচ্ছন্দে নেপাল হয়ে পাকিস্তানে চলে গেলেন। জনাব বদরুদ্দিনের মতো আরও অনেকেই বঙ্গবন্ধুর বদান্যতা, মহত্ত্বের বিশাল হৃদয়ের ছোঁয়া পেয়েছিলেন। এমনই অনেক কাহিনি রয়েছে। ছোট-বড়-মাঝারি সেসব কাহিনির জন্ম হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন বলেই। বদরুদ্দিনের এটি নিছক কাহিনি নয়, একটি সিংহ হৃদয়ের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ছবিমাত্র। তখনকার পরিস্থিতিতে বিচিত্র ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা বটে। কারণ, বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার কয়েক দিন আগেই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ঢাকা স্টেডিয়ামে বদরুদ্দিনদের, পাকিস্তানপন্থীদের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে, তা দেখিয়েছিলেন একজনকে প্রকাশ্যে খতম করে। দেশের তৎকালীন সামগ্রিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরাট ক্যানভাসে নয়, অনেকের মনের গহিন থেকে এসব কাহিনি লুপ্ত হয়ে গেছে।

পঁচাত্তরের অনেক বছর পর লাহোরে বদরুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'আল্লাহর শোকর, শেখ সাহেব ফিরে এসেছিলেন। তাই তো বেঁচে আছি। এখনো বহাল তবিয়তে আছি।' তারপরই মাথা থাবড়াতে থাকলেন, 'ইয়ে ফেরেশতা কো তোমলোক খুন কিয়া?'

শেখ মুজিবের বিশাল হৃদয়খানি

শেখ মুজিবকে যাঁরা জানতেন, চিনতেন ও বুঝতেন, তাঁদের অনেকেই বেঁচে নেই। আমিও কি পুরোপুরি জেনেছিলাম? যতটুকু জেনেছি ব্যক্তি মুজিবকে, জাতির পিতাকে, ততখানি অনুভব বা অনুধাবন করতে পারিনি। তবুও আমার জানা, চেনা ও বোঝার বিষয়টিকে যতটুকু সম্ভব গুরুত্ব দিতে চাই। কারণ, শেখ মুজিবকে নিয়ে আলোচনায় কখনো ব্যক্তি মুজিবকে পরিচিত করানো হয় না। জাতির পিতা শেখ মুজিব, স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিব, রাজনীতিবিদ ও একটি জাতিসত্তার প্রবক্তা, একটি স্বাধীন দেশের রূপকার, ব্যর্থ বা সফল প্রশাসক শেখ মুজিব আলোচিত হন, সমালোচিত হন, কিন্তু ব্যক্তি মুজিব খুব কমই প্রকাশ্য আলোচনায় এসেছেন। অথচ ব্যক্তি মুজিব, আমাদের 'মুজিব ভাই' এবং জনগণের 'শ্যাখ সাব', আমার মতে, বঙ্গবন্ধু বা জাতির পিতা অথবা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি নয়, মুজিব ভাই,' যাঁকে আমরা অনেকে শুধু 'নেতা' বলে সম্বোধন করতাম, তিনি ভিন্ন পরিমাপে আলোচিত হতে পারেন। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় আমি ব্যক্তিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বলেই তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন লিখেছি। অনেক সময় দেখেছি, প্রয়াত মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনায় ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে তাঁর কর্মপরিধি নিয়ে বক্তব্য বেশি করে দেওয়া হয়। অথচ ব্যক্তিগত গুণের কারণেই আমাদের দেশে নেতারা মহত্ত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সাধারণ মানুষের বুকে স্থান পেয়েছেন।

এ কথা আমাকে বলতে হবে না, তাঁকে যাঁরা জানতেন-চিনতেন, তাদের সবাই বলেন, শেখ মুজিবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর বিরাট হৃদয়।

কেউ কেউ বলেন, বিশেষ করে তাঁর সমসাময়িক কোনো রাজনীতিবিদ বলতেন, শেখের মাথায় কিছু নেই, মুখের জোরে রাজনীতি করে গেল। জনগণের আবেগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—এসব ঢালাও মন্তব্যের জবাবে বলতে হয়, এ দেশে নেতা হওয়ার জন্য একটিমাত্র বস্তু অতীব প্রয়োজনীয়। তা হচ্ছে হৃদয়, বিরাট একটি হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। সর্বোপরি প্রয়োজন ক্যারিশমা, জনগণকে কাছে টানার, উদ্বেলিত করার, বিশেষ আদর্শে নেশাগ্রস্ত করার চুম্বকশক্তি অথবা জাদু। এ জন্য একটি বড়সড় ওজনদার কলিজা থাকতে হবে। শেখ মুজিবের তা ছিল। শেরেবাংলা, সোহ্‌রাওয়ার্দী, সি আর দাশ, মওলানা ভাসানীর অন্য গুণ থাকুক বা না থাকুক, সেটা ভিন্ন নিরিখে বিচার করতে হবে। তাঁদের ছিল বিরাট কলিজা। যাকে বলে দরাজ দিল। তাই ব্যক্তি মুজিবের আলোচনায় তাঁর বিরাট কলিজা তথা বিশাল হৃদয়ের কথাই বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলতে হবে বৈকি!

শেখ মুজিবের চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিকই ছিল এই নরম কলিজা। অনেকে বলেন, শেখ মুজিব জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, একটি জাতির জন্ম দিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই স্বাধীনতার পর নানা সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। নিজের জনগণের জন্য দিলটি খুলে দিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু সমাজটিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা, ক্ষমতা, ক্রূরতা ও কূটনৈতিক আচ্ছাদনের আড়ালে চাপা দিয়েছিলেন। এই বক্তব্য আমি বলব সঠিক ও বেঠিক, উভয় অর্থেই সত্য। আবার একই যুক্তিতে বলতে হয়, একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে শেখ মুজিব ছাড়া অন্য আর কেউ পুনর্গঠিত করতে পারতেন না। একটি রাজনৈতিক আঙিনায় বিভক্ত জাতিকে একই ছত্রচ্ছায়ায় তিনি ছাড়া আর কেউ আনতে পারতেন না। এই একত্রীকরণে হয়তো কিছু কৃত্রিমতা ছিল। কিন্তু সেটুকুই-বা তিনি ছাড়া আর কে করতে পারতেন? উপরিউক্ত কর্তব্য সাধনে তিনি তাঁর আন্তর্জাতিক পরিচয় ও ক্যারিশমা কাজে লাগিয়েছেন। আবার এ কথাও মানতে হবে রাষ্ট্র, সরকারের ও দেশের পুনর্গঠনে শূন্য কোষাগার নিয়ে দুনিয়ার কেউ কোনো রাষ্ট্রের হাল ধরেননি, যেমনটি শেখ মুজিবকে করতে হয়েছে। ইরাক থেকে ভিক্ষে করে তেল এনেছেন, রাশিয়ানদের

পটিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর পরিষ্কার করিয়েছেন ও মাঠঘাট থেকে মাইন সরিয়েছেন। একে-ওকে ধরে টাকাপয়সা এনে বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, পুল, কল-কারখানা মেরামত করেছেন—এসবই হলো বাহ্যিক রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম। এর বাইরে যে মহৎ আরও একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল, সে কথা আগেও বলেছি। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ও সরকারের হাল না ধরলে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিত, সে কথা খুব কমই আলোচিত হয়। তিনি একটি সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ থেকে দেশকে বাঁচিয়েছিলেন। ভারতীয় সেনাদের ফেরত পাঠিয়েছিলেন—তথ্যটি কেউ ইচ্ছায়, কেউ অনিচ্ছায় উদ্ধৃত করে থাকেন, কিন্তু দেশ ও জাতি যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খল অবস্থা এড়িয়ে যেতে পেরেছিল, তা সাধারণত আলোচনায় আসে না। অথচ বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে না ফিরলে যে রক্তের স্রোত বয়ে যেত, অনেকেই তা বুঝে থাকলেও বলেন না। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরপরই দেশের সর্বত্র প্রতিশোধের পালা শুরু হয়েছিল। দেশের অন্যত্রও একটু-আধটু করে হত্যা, পাল্টা হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল। শেখ মুজিব দেশে ফিরে না এলে অন্য কারও পক্ষে তা বন্ধ করা সম্ভব হতো না। এখানেই শাসক মুজিবকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব শেখ সাহেবের, মুজিব ভাইয়ের আর অগণিত জনতার অবিসংবাদী নেতার।

শুধু শেখ মুজিব ফিরে আসাতেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হলো কেন? কারণ, সবাই জানতেন, তিনি প্রতিশোধের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করবেন না। পরবর্তীকালে এই একটিমাত্র কারণে তাঁকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে। তাঁর আগমনের কারণে যাঁদের জীবন রক্ষা পেয়েছে, তাঁরাই তির্যক মন্তব্যের সঙ্গে প্রশ্ন করে থাকেন, কেন তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন? অথচ মুজিব ভাই পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেই যাঁদের খোঁজখবর নিয়েছিলেন, তাঁরাই রাজনৈতিক জীবনে তাঁর পরম শত্রু ছিলেন কিংবা ছিলেন পরম সমালোচক। এমনই একজনের কাহিনি সেদিন আমি স্মৃতিসভায় বিস্তারিতভাবে বলেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ রকম বিরাট আত্মার পরিচয় পেয়েছেন তাঁর সমসাময়িক সব রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের সব স্তরের মানুষ। রাজাকারি কার্যকলাপের জন্য তাঁর প্রত্যাবর্তনের আগেই যাঁদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা

বিষয়টি যতই অস্বীকার করুন, তাঁরা যে শেখ মুজিবের কারণেই জানে বেঁচে গিয়েছিলেন, জেল থেকে বের করে এনে খুন করা হয়নি, রাস্তায় বা গ্রামেগঞ্জে গণপিটুনিতে নিহত হননি—সে কথা স্বীকার করতেই হবে। পরবর্তীকালে তাঁরা গণহত্যার অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বেঁচে থাকতেন না, তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আজকে বিশ্বব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি না। বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় হত্যাকারীরা যেভাবে পার পেয়ে গেছে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ছলনার সুযোগে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসররা একাত্তর-পরবর্তী অবস্থানে ফেরার সুযোগ পেতেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফজলুল কাদের চৌধুরী, শাহ আজিজ বেঁচে গিয়েছিলেন জেলে ছিলেন বলে। বেচারা ফরিদ আহমদ সময়ে ধরা পড়েননি বলে মারা গেলেন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন মরতে মরতে পার পেয়ে গেলেন। শেখ মুজিব ফিরে না এলে জেলেও তাঁরা নিরাপদ থাকতে পারতেন কি না, সন্দেহ। তৎকালীন পরিস্থিতির কারণে শেখ সাহেব তাঁদের জেলের বাইরে আনতে পারেননি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যে প্রত্যেকের খোঁজখবর নিতেন এবং তাঁদের কারও কারও পরিবারকে যে নিজেই ভরণপোষণ করেছেন, সে কথা কেউ কেউ জানেন বৈকি! প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজাকারদের জন্য এত দরদের কী দরকার ছিল? উত্তর হচ্ছে, প্রয়োজন বা যুক্তি দিয়ে হৃদয় চালিত হয় না। অন্যদিকে হৃদয় যদি প্রাধান্য পায়, তাহলে মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হতে পারে না। প্রশাসনিক কাজে যদি বঙ্গবন্ধু ব্যর্থ হয়ে থাকেন, সরকার পরিচালনায় যদি ছোটখাটো শৈথিল্য দেখিয়ে থাকেন, তার পেছনের কারণটি কোনো বাঙালির না বোঝার কারণ নেই। বাঙালির স্বভাবসুলভ আবেগই প্রাধান্য পেত বঙ্গবন্ধুর অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে, যদি কোনো অপরাধে তিনি অপরাধী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর চিত্ত-বৈকল্যকে দায়ী করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু যখন ৩২ নম্বর থেকে গণভবন যেতেন ঢাকার রাস্তা বন্ধ থাকত না। সামনে খোলা জিপে থাকতেন হয় এসপি মাহবুব অথবা সার্জেন্ট নবী চৌধুরী। ঢাকার রাস্তার দেয়ালে তখন একটি স্লোগান চোখে পড়ল, 'বঙ্গবন্ধু কঠোর হও'। তিনি বলতেন, কার প্রতি কঠোর হব, কীভাবে হব, কেনই-বা হব? কেউ কেউ বলেন, শেখ মুজিব সমগ্র বাংলাদেশকে তাঁর

জমিদারি মনে করে একক হুকুমে চালাতেন। আসলে তিনি সমগ্র বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে একটি পরিবার মনে করতেন, নিজে ছিলেন সেই পরিবারের প্রধান। পরিবারে সবাই ছিল তাঁর স্বজন, আপনজন, আত্মার আত্মীয়। সাড়ে সাত কোটি আত্মীয় বাঙালির কেউ অপরাধ করলে দুর্বিনীত বা বেয়াদব বলে দুটি ধমক দিয়েই ক্ষান্ত হতেন, শাস্তি দিতে পারতেন না, কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেননি। একটি কথা তখনকার দিনে চালু ছিল, খুন করেও যদি একবার আগেভাগে বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছানো যেত, তাহলে সব অপরাধ মাপ হয়ে যেত। শুধু পায়ের ওপর পড়ে বললেই হতো, 'অপরাধ করে ফেলেছি, এখন কী করব?' তিনি পিঠের ওপর দুটি থাপ্পড় দিয়ে বলতেন, 'যা হতভাগা, এবার বেঁচে গেলি। আর কখনো এ রকমটি করিস না।' কথাটি হয়তো পুরোপুরি সত্যি নয়। দেশ ও সরকার এ রকম খেয়াল-খুশিমতো চালিয়েছেন—বঙ্গবন্ধুর সরকার সম্পর্কে এমন ধারণা করা সংগত হবে না। আবার এ-ও ঠিক, স্নেহ, ভালোবাসা ও মমতায় ভরা হৃদয়খানি তাঁকে অনেক সময় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দেয়নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আবেগভরা এই প্রতিবেদনে ব্যক্তি মুজিবের একটি দিক সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করেছি। এ দেশে অনেক মহান নেতার জন্ম হয়েছে, রাজনীতির অঙ্গনে অনেকে কুশলী পদচারণ করেছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি-মেধায় রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় তাঁর চেয়ে অনেক বেশি উপযুক্ত কেউ কেউ ছিলেন বৈকি; কিন্তু তাঁর মতো কি কেউ জনগণকে ভালোবাসার কথা বলতে পারতেন? এ দেশের মহাপুরুষদের সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। অনেক কাহিনি শোনা যায় হক সাহেব, ভাসানী, সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্পর্কে, শেখ মুজিবুর রহমানের সমসাময়িককালে যাঁরা রাজনীতি, সমাজ, সাংবাদিকতা ও বিভিন্ন পেশায় জড়িত ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে তাঁরা সবাই, এমনকি সাধারণ মানুষও তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক, এমনকি পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনেক কাহিনি বর্ণনা করে থাকেন, কিন্তু তাঁরা কি দেশের সব সাধারণ মানুষের প্রত্যেকের না হোক, ব্যক্তিগত সবার জীবন, পারিবারিক পরিচয় জানতেন, খুঁটিনাটি খবর রাখতেন। বঙ্গবন্ধু একমাত্র একটি মানুষ, যাঁর সম্পর্কে সবাই বলতেন, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে

তিনি নাম ধরে সম্বোধন করতে পারতেন। এটি সম্ভব ছিল তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কারণে। বাংলার যেকোনো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে-কেউ দেখা করতে এলেই বলতেন, 'আরে তুই অমুক গ্রামের অমুকের পোলা না? তোর দাদা কেমন আছে, সেই ছোট্ট বোনটির বিয়ে হয়েছে?'

এই কারণে ক্যারিশমা শব্দটি শুধু শেখ মুজিবের ক্ষেত্রে এক শ ভাগ প্রযোজ্য ছিল। এ নিয়ে একটি কাহিনি আমি আগেও কয়েকবার বলেছিলাম। ফেনীর মরহুম রুহুল আমিনকে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ভুসির ব্যবসা করত বলে তার নামই দিয়েছিলেন তিনি 'ভুসি'। আমি তখন সংসদ সদস্য। এলাকায় গেলেই আমার কাছে ভ্যানভ্যান করত, 'আমার কিছু হলো না, দেশ ও দলের জন্য এত কিছু করেছি, সর্বস্বান্ত হয়েছি। মুজিব ভাই প্রধানমন্ত্রী হলেন অথচ আমি কিছুই পেলাম না।' এত সব ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে বিরক্ত হয়ে বললাম, 'চলো, তোমাকে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যাই। যা বলার তাঁকেই বলো।'

ঢাকায় এল ভুসি, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। বঙ্গবন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরলেন, 'ওরে আমার ভুসি আস্ছে' বলে হইচই করে উঠলেন। ভুসি মাখনের মতো একেবারে গলে গেল। বঙ্গবন্ধু যতই বলেন, 'কেমন আছিস, কোনো অসুবিধা নেই তো', ভুসি ততই খালি তোতলায় আর বলে, 'ভা-ভা ভালোই আছি। ক-ক কোনো অসুবিধা নেই।' বঙ্গবন্ধু তার পরিবার, এলাকার, দেশের অবস্থার খোঁজখবর নিলেন, আধা ঘণ্টা পরে ভুসিকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। রেগে বললাম, 'কী হলো, এত প্যানপ্যানানি গেল কই, কিছুই তো বললে না, চাইতে পারলে না!' ভুসি আমতা আমতা করে বলল, 'কী করব, নেতাকে দেখে যে সবই ভুলে গেলাম।'

বুঝলাম, এরই নাম ক্যারিশমা। ইনিই হচ্ছেন একমেবাদ্বিতীয়ম শেখ মুজিব, জনগণের শেখ সাহেব, কর্মীদের মুজিব ভাই। সহকর্মীরা তাঁকে সম্বোধন করেন 'নেতা' বলে। সাধারণ মানুষ বলে 'শ্যাখ সাহেব', কর্মীরা বলে 'নেতা' অথবা 'মুজিব ভাই'। 'বঙ্গবন্ধু' বলেন তাঁরা, যাঁরা তাঁকে সসম্মানে দূরে সরিয়ে রাখেন, ভালোবাসেন কতটুকু জানি না। এসবই হতে পেরেছিলেন তিনি যেহেতু বিরাট একখানি হৃদয় নিয়ে জনগণের কাছে যেতে পেরেছিলেন, জনগণ তাঁর কাছে আসতে পেরেছিল।

দেশে ফেরার মাস খানেক পরে বিবিসির ডেভিড ফ্রস্ট তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ঢাকা এলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি কী, হোয়াট ইজ ইওর স্ট্রেংথ?' বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন, 'মাই পিপল। আমার জনগণ।' তার পরের প্রশ্ন, 'হোয়াট ইজ ইওর উইকনেস? আপনার সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা কী?' উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার জনগণের জন্য ভালোবাসা। মাই লাভ ফর মাই পিপল।' শেখ মুজিবুর রহমানই একমাত্র জাতির জনগণের নেতা, যিনি গর্বের সঙ্গে এমনটি বলতে পারতেন। তাঁর সারা জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা, যা-ই বলা হোক, সবকিছুর মূলেই ছিল তাঁর এই জনগণ, তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, তাদের অধিকার আদায়ে হৃদয়ের দৃঢ়চিত্ততা আর তাদেরই বিশ্বাসঘাতকতা, মোনাফেকির আগাম খবর জানা সত্ত্বেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা হয়েছিল ছিল তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতা। তাঁর কথাগুলো তাই একটু অন্যভাবে বলতে চাই। শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট তথা সম্পদ ছিল তাঁর বিশাল হৃদয়, তাঁর লায়াবিলিটি, দুর্বলতা এবং সবচেয়ে বড় শত্রুও ছিল তাঁর মহত্ত্বে ভরা মহান হৃদয়খানি। সবার জন্য এই অন্ধ ভালোবাসার জন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। শেখ মুজিবের দেহ নয়, একটি মহান আত্মার মৃত্যু হয়েছে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট।

অকুতোভয় পিতা, নিবেদিতপ্রাণ পুত্র

আশির দশকে ঢাকার রাস্তার দেয়ালে চিকা তথা দেয়াললিখন দেখা যেত, 'জাতি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চায়'। সেটি দেখে আমি আওয়ামী লীগের একজন নেতাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কার কাছে চায়? বলতে হবে, জাতি বিচার করবে।' নানা বাধা-বিপত্তি, ওজর-অজুহাত, ষড়যন্ত্র আর অশুভ চক্রান্তের অবসান ঘটিয়ে জাতি বিচার করেছে। জনগণের পরম প্রত্যাশা বা দাবি পূরণে এত বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রতার কারণ তারা প্রকৃত অর্থে ৩৪ বছরের অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় ছিল না বলে। জনগণ প্রথম দফায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনেছিল বিচারের সূচনা করতে। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এনেছে অনেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যাশা পূরণের এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিচারকাজ সম্পন্ন করার জন্য। তার পরও এই বিচার শুরু ও শেষ করায় ছিল নানা সমস্যা। আইনি দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য অকুতোভয় ও একনিষ্ঠ আইনজীবী কোথায় পাওয়া যাবে, সেই প্রশ্নটিও গুরুত্ব পায়। সব সমস্যারও সমাধান করেছেন, প্রত্যাশা পূরণ করেছেন বংশানুক্রমে দুজন আইনজীবী। আজ তাঁদের কথাই বলব।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণার খবরটি শুনেই সিরাজ ভাবিকে, অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের স্ত্রীকে টেলিফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার মনের অনুভূতি কী? বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের সর্বশেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন শ্রদ্ধেয় আইনজীবী সিরাজুল হক সাহেব, আপনার স্বামী। শেষ করলেন আপনার ছেলে স্নেহভাজন আনিসুল হক। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই

বলেছেন, জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে, দায়মুক্ত হয়েছে। স্বামীর অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পাদিত হওয়ায় একজন পরিতৃপ্ত স্ত্রী ও গর্বিত মাতা, তথা একজন বাঙালি নারীর অনুভূতি কী?' সবাই যা বলেছেন তার বাইরে গিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তার সব এখন বলছি না। তিনি যা বলেছেন, সে সম্পর্কে প্রথমেই বলব, দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেছেন, 'এ রায় ঐতিহাসিক। জাতি এর জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে ছিল।' এরশাদ কি নিজেকেই পরিহাস করলেন? তিনি নিজেকেও কি অপেক্ষাকারীদের একজন মনে করেন? জেনারেল জিয়া খুনিদের বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে এরশাদ সেই সব খুনির চাকরির মেয়াদ বাড়িয়েছিলেন। কয়েকজনকে পদোন্নতিও দিয়েছিলেন। তাহলে তাঁর অপেক্ষাটির কোনো ব্যাখ্যা তো খুঁজে পাচ্ছি না। বিএনপির দলীয় প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ, তাদের মনে সংগত কারণে একটি অপরাধবোধ রয়েছে, যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বঙ্গবন্ধু হত্যা ও বিচার নিয়ে এত কথা, এত লেখালেখি হলেও আরও একটি বিস্মৃত ঘটনার উল্লেখ কেউ করেননি। এরশাদ আমলে বিলেতের প্রবাসী বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত ও বিচারের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য একজন ব্রিটিশ আইনজ্ঞ পাঠাতে চেয়েছিলেন। সেই আইনজীবীকে ভিসা দেয়নি এরশাদ সরকার।

সিরাজ ভাবি তথা বেগম জাহানারা হকের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। বিচার পরিচালনায় তিনি পিতা-পুত্র উভয়েরই ছিলেন প্রেরণাদায়িনী। রায় জানার পর টেলিফোনে তাঁর স্মৃতিচারণা করলাম, মনে করলাম অতীতের অনেক কাহিনি। মনে হলো তাঁকে নস্টালজিয়ায় পেয়েছে, পুরোনো দিনের স্মৃতি তাঁকে আবেগাপ্লুত করেছে। প্রথমেই সিরাজুল হকের জীবনকাহিনি, এই মামলার ব্যাপারে তিনি কীভাবে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন—কেন এবং কিসের দায়ে? ভাবি আলোচনায় সুদূর অতীতে চলে গেলেন। সেই অতীত সবটা না হলেও অনেকখানি আমার জানা ছিল।

একসময় ঢাকায় মোহাম্মদপুরে আমরা দুই পরিবার এক পাড়ায়—বর্তমান ইকবাল রোডের পাশাপাশি দুই রাস্তায়—দীর্ঘ ২০ বছর একসঙ্গে ছিলাম। বস্তুত, একটি বিরান ভূমিতে ৪৫ বছর আগে আমরা দুজনই সরকার-প্রদত্ত জমিটিতে বাড়ি করেছি। সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব

ও অন্তরঙ্গতার সূচনা তখন থেকেই। তদুপরি অন্য একটি যোগসূত্রও ছিল। আমার পরম স্নেহভাজন সাংবাদিক আতাউস সামাদ ভাবির ছোট ভাই। আবার সিরাজ ভাইয়ের ছোট বোনের স্বামীও বটে। সেই সূত্রে তাঁকে ভাবি বলতাম, আপাও বলতাম।

মোহাম্মদপুর ইকবাল রোডে আশপাশে বসতি ছিল না। তাই অবসরে সিরাজ ভাইয়ের বাড়িতে আড্ডা জমাতাম। সেখানে ভাবিও থাকতেন। জেনেছি, সিরাজ ভাইয়ের ছোটবেলা কেটেছে তাঁর পুলিশ কর্মকর্তা বাবার কর্মস্থল খুলনায়। ফরিদপুর জেলা হলেও গোপালগঞ্জ তখন খুলনার আওতাভুক্ত। মধ্যিখানে একটি নদী, কী যেন নাম, সম্ভবত কুমারখালী। এই পারে শেখ মুজিব, ওই পারে সিরাজুল হক। বোধ হয় দুজন একই স্কুলে পড়তেন। নদী সাঁতরে বা নৌকায় করে দুজনই এপার-ওপার করে পরস্পরের গভীর সান্নিধ্যে এলেন। ইনট্রোভার্ট, অন্তর্মুখী সিরাজুল হক আর আড্ডাবাজ মুজিবের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। অতঃপর বন্ধুত্বে দীর্ঘ ছেদ। কলকাতায় আবার দেখা হলো দুজনার। একজন ইসলামিয়ায়, অন্যজন প্রেসিডেন্সিতে, থাকতেন একসঙ্গে বেকার হোস্টেলে। সিরাজুল হক পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে রইলেন, শেখ মুজিব অবিভক্ত বাংলায় শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। দেশ ভাগ হলো। নবীন বন্ধু তখন রাজনীতির চূড়ায়, অন্য বন্ধু তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চপদস্থ কাস্টমস অফিসার। তবে স্বাধীনচেতা সিরাজুল সরকারি চাকরিতে মানিয়ে নিতে পারলেন না। এলেন আইন পাস করে ওকালতি পেশায়। ঢাকায় আবার দেখা হলো দুজনার। বন্ধুত্ব গাঢ়তর হলো। একই সঙ্গে গড়ে উঠল একটি রাজনৈতিক বন্ধন। সেই বন্ধুত্বের মায়ায় আগরতলা মামলায় আসামিপক্ষে বাঘা আইনজীবী আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, তরুণ ব্যারিস্টার কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমিনুল হক (জেলখানায় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের ভাই, এখন প্রয়াত), ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, তরুণ মওদুদ আহমদের সঙ্গে যোগ দিলেন অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক। ইতিপূর্বের দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্কের কারণেই বোধ হয় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এই আইনজীবী বন্ধুর রাজনীতির সঙ্গে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়লেন। সত্তর আর তিয়াত্তরে আওয়ামী লীগের সাংসদ হলেন।

সিরাজ ভাবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দুই পরিবারের আত্মার সম্পর্কের আরেকটি হৃদয়গ্রাহী অতীত কাহিনি বলতে হয়। *প্রথম আলোয়* 'প্রেরণাদায়িনী ফজিলাতুন্নেসা' প্রতিবেদনে প্রসঙ্গটি পুরোপুরি উল্লেখ করিনি। তবে প্রশ্ন রেখেছিলাম, 'শেখ মুজিব যখন জেলে অথবা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে বেড়াচ্ছেন, তখন কীভাবে সংসারের হাল ধরেছিলেন অসহায় এক মহীয়সী নারী? আগরতলা মামলার সামান্যতম খরচ জোগাতেন কী করে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দুই বেলা আহার জোটাতেন কীভাবে?' একই দুশ্চিন্তা ছিল বেগম সিরাজুল হকেরও। নিজের গয়না বেচে মুজিব পরিবারে অতিপরিচিত কয়েকজনের মাধ্যমে অতি সঙ্গোপনে সংসার-খরচের টাকা পাঠিয়ে দিতেন। সেই অজানা গোপন কাহিনি আজ বঙ্গবন্ধুর বন্ধুভাগ্য নিয়ে আলোচনায় ভাবির বিনা অনুমতিতেই ফাঁস করে দিলাম।

যা-ই হোক, আগরতলা মামলা ভেস্তে গেল, জনতা 'জেলের তালা ভাঙল, শেখ মুজিবকে আনল'। পরের ইতিহাস আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠক, ছয় দফা ঘোষণা, আইয়ুব খানের পতন, ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ। রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঢাকায় ফিরে এসে শেখ মুজিব প্রথমেই মোহাম্মদপুরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেই দেখা করার সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধু সিরাজ ভাইয়ের বাড়িতে কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর বললেন, 'পাশেই কোথায় যেন মূসা থাকে। তার বাড়িতে যেতে হবে। তার ছেলেকে দেখব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।' প্রতিশ্রুতির পাশ্চাৎপটটি বলতে হয়। আগরতলা মামলা চলাকালে আমার ছেলের জন্ম হয়। *পাকিস্তান অবজারভার*-এর জন্য মামলার রিপোর্ট সংগ্রহে আদালতে অন্যদের মধ্যে রিপোর্টার আবদুর রহিমকেও পাঠাতাম। রহিমকে বললাম, 'নেতাকে বলো, আমার একটি ছেলে হয়েছে। তিনি যেন দোয়া করেন।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'মূসার ছেলেকে দেখতে যাব।' বার্তাটি পেয়ে অবাক হয়ে বললাম, কদিন পর যিনি নিশ্চিত ফাঁসির দড়িতে ঝুলবেন বলে আমরা নিশ্চিত ছিলাম, সেই তিনি শিগগিরই আমার বাড়িতে আসবেন, বলেন কী? সেই কথাটি ভুলেই গিয়েছিলাম, টেলিফোন পেয়ে মনে পড়ল।

সিরাজ ভাবি টেলিফোনে আমার স্ত্রীকে বললেন, 'মুজিব ভাই আপনার বাড়িতে যাচ্ছেন।' তিনি আমার কর্মস্থল *পাকিস্তান অবজারভার*-এ ফোন করলেন, 'জলদি আসো, শেখ সাহেব আসছেন।' গাড়িতে অতি দ্রুত বাড়ি এসে পৌঁছালাম। ইতিমধ্যে মুজিব ভাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন কিশোর শ্যানন ওরফে আনিসুল হক, যে পরবর্তীকালে পিতার অসমাপ্ত কর্তব্য বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করেছিল। আমার বাড়িতে এসে মুজিব ভাই আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে তার গলায় একটি সোনার চেইন পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার ভাবি দিয়েছে।' একটি বেবিস্যুট, তখন বলা হতো 'বাবা-স্যুট' আর এক বাক্স মিষ্টি দিলেন আমার স্ত্রীর হাতে। আমাকে দেখেই কৌতুক করে বললেন, 'কি রে, এলাম তো! জানি, যখন আসব বলেছিলাম তখন তো বিশ্বাস করিসনি, এখন নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিস!' অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে, তাঁর অসামান্য স্মরণশক্তি ছিল—এই তুচ্ছ বিষয়টি মনে রেখে ছিলেন বলে।

মনে পড়ল, চৌষট্টিতে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে ঢাকার তৎকালীন জেলা প্রশাসকসহ (এম কে আনোয়ার, বর্তমানে বিএনপি নেতা) তিনি রায়েরবাজার ও মোহাম্মদপুরে এসেছিলেন, তখনো একবার এই বাড়িতে এসেছিলেন। কারফিউর মধ্যে আচমকা দুজনে ইকবাল রোডের বাড়িতে এসে আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'খিদে পেয়েছে, ভাতটাত কিছু আছে?'

যা-ই হোক, সূচনা করেছিলাম সিরাজ ভাবিকে দিয়ে, মধ্যিখানে একটি নিজস্ব কাহিনির বর্ণনা হয়তো অবান্তর মনে হতে পারে। তবু বললাম, ইতিপূর্বে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত 'অন্তরঙ্গ আলোকে বঙ্গবন্ধু' উপাখ্যানে বলা হয়নি বলে।

সিরাজ ও মুজিবের মধ্যে প্রাণের যে বন্ধন, সে বিষয়টি শেখ হাসিনার অজানা ছিল না। তাই বুঝেছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় তিনিই একমাত্র অকুতোভয় হতে পারবেন। হত্যাকারীদের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা ব্যক্তিরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ইনডেমনিটির বাধা সরিয়ে নতুন সরকার মামলা শুরু করল। মামলা পরিচালনায় বাঘা বাঘা আইনজীবীদের কাউকে নয়, সিরাজুল হককে কেন বেছে নিলেন শেখ

হাসিনা? শেখ হাসিনা জানতেন, মামলা পরিচালনায় পার হতে হবে অনেক বাধা-বিপত্তি আর আইনি চড়াই-উতরাই। আসবে ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি। এসব ভয়ংকর ও অশুভ শক্তির মোকাবিলা একটিমাত্র নির্ভীক দৃঢ়চেতা ব্যক্তিই করতে পারবেন—তিনি সিরাজুল হক, যিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার কয়েক দিন পর বঙ্গভবনে ফারুক-রশিদ-বেষ্টিত মোশতাককে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন মুজিবকে খুন করেছ?' তাঁর মুখে শুনেছি, পরবর্তীকালে ক্ষমতাচ্যুত মোশতাকের আগা মসি লেনের বাড়িতে গিয়েও সিরাজ ভাই বলেছিলেন, 'তুমি খুনি!'

আবারও মামলা প্রসঙ্গে আসি। ইনডেমনিটি তথা দায়মুক্তি আইন বাতিল হলো। মামলা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিরাজ ভাই তখন বনানীর নতুন বাসস্থানে। মামলার অগ্রগতি জানতে, এ সম্পর্কে লিখতে প্রায়ই তাঁর বাসায় যেতাম। তখন আইনজীবী সিরাজুল হকের কাছে আমি অত্যন্ত গুরুতর একটি প্রশ্ন করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, ফৌজদারি কার্যক্রম অনুসরণে সাধারণ হত্যা মামলার বিচার করা হবে, নাকি বিশেষ আদালত ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে? তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'হাসিনাকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের পরামর্শ দিয়েছি, কিন্তু শেখ হাসিনা তাঁর মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে বিদ্যমান ফৌজদারি আইনে বিচার-প্রক্রিয়া অনুসরণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।' শেখ হাসিনার যুক্তি ছিল, 'জাতি প্রতিশোধ চায় না, খুনির বিচার চায়। সেই বিচার-প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও প্রশ্নাতীত হতে হবে। বিশ্ব অঙ্গনে যেন এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হয় না, এ কথাটি মাথায় রাখতে হবে।'

আইনজীবী সিরাজ ভাই শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে আমাকে বলেছিলেন, মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার হলে তার স্বচ্ছতা ও দ্রুত আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন সুবিচার নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক সন্দেহ প্রকাশ করা হতে পারত। বলা হতো, বিচার যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় হয়নি, ধরে-বেঁধে ফাঁসি দেওয়া হলো। বিচার শেষ হতে ৩০০ কর্মদিবস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বিচার যে স্বচ্ছ ও সঠিক হয়েছে, তা আসামিপক্ষের আইনজীবীরাও স্বীকার করেছেন। তাই তো চূড়ান্ত বিচারকালে তাঁরা কখনো মক্কেলদের নির্দোষ বলেননি। শুধু দণ্ড লাঘব করার আবেদন

জানিয়েছেন। শেখ হাসিনার সিরাজ ভাইয়ের দেওয়া বিচারপ্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে।

মামলা চলাকালীন বনানীর বাড়িতে এসব আলোচনার সময় সদ্য সনদপ্রাপ্ত আনিসুল হকও উপস্থিত থাকত। প্রথম থেকেই সমগ্র বিচার-প্রক্রিয়ায় বাবার সঙ্গে ছেলে জড়িত ছিল। আইনের পুস্তক ঘেঁটে সঠিক সূত্রগুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। তখন কি সে জানত, একদিন বাবার বোঝা, অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনের কর্তব্যটি তাঁর কাঁধেই চাপবে। বাবার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ায় ছেদ ঘটিয়ে দেশে ফিরে আইনি ডিগ্রি নিয়ে বাবার পাশে দাঁড়াল। বুঝে নিয়েছিল বাবার মামলা পরিচালনার কর্মপদ্ধতি। বাবার মনেও কি জানা হয়ে গিয়েছিল, একটি দীর্ঘ বৈচারিক পদ্ধতির শুরু করেছেন, হয়তো শেষটি দেখে যেতে পারবেন না। আমার মনে হয়, তিনি আমাদের বৈচারিক পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই সন্তানকে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসেবে তৈরি করেছিলেন। বাবার অসমাপ্ত মহান উদ্যোগটি সফল করার দায়িত্ব নিষ্ঠাবান সন্তান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে, অনন্য একটি ঐতিহাসিক মামলায় জিতে যুদ্ধজয়ের গৌরববোধের চেয়েও অধিকতর তৃপ্তি পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

একটি সদ্যোজাত স্বাধীন দেশ। সে দেশের সরকারি কোষাগারে কোনো টাকাপয়সা নেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কোনো সুসংবদ্ধ পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনে কোনো অভিজ্ঞতা আছে, এমন সরকারি কর্মচারী, এমনকি কোনো প্রশাসনিক অবকাঠামো নেই। শুধু একটি ভৌগোলিক সীমানা, একটি মানচিত্র, গর্ব করার মতো একটি ইতিহাস আর একটি পতাকা নিয়ে যাত্রা শুরু একটি জাতির। সেই জাতির নেতৃত্বে আছেন একজন সর্বজনমান্য জননেতা, যাঁর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে এই অগোছালো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার। দেশটির নাম বাংলাদেশ, নেতার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'একটি ইউনিয়ন কাউন্সিল চালানোর অভিজ্ঞতা নেই, এদের নিয়ে আমাকে সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশ চালাতে হচ্ছে, এ কথাটি কেউ বুঝতে চায় না।'

একটি নতুন দেশের সরকারের কান্ডারি শেখ মুজিবুর রহমানের সারা জীবনের অনেক সফলতা-বিফলতা ও কীর্তি আলোচিত হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু একটি নিঃস্ব, বিশৃঙ্খল, অগোছালো দেশকে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদেরই এই রাজার রাজত্বে' কীভাবে পুনর্গঠিত করেছিলেন, তা কখনো পরিপূর্ণভাবে নির্মোহ আলোচনায় বিশ্লেষণ করা হয়নি। তাঁর নেতৃত্বের অবদান স্বীকার করা হয়, কিন্তু '৭২ থেকে তিনি কীভাবে প্রশাসনিক কর্তব্য পালন করেছিলেন, জাতির পিতা, প্রধানমন্ত্রী, পরে স্বল্প সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ

গঠনে কী ভূমিকা পালন করেছেন, সে মূল্যায়ন আজও হয়নি। বরং কথিত প্রশাসনিক ব্যর্থতার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচারই হয়েছে বেশি।

সাধারণভাবে শুধু একটি কথা বলা হয়, বিরাট সিংহ-হৃদয়ের অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে কঠোর হতে পারেননি বলে ব্যর্থ হয়েছিলেন। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি বিত্তহীন দরিদ্র মানুষের বোঝা তিনি কীভাবে টেনে নিয়ে গেছেন, শূন্য হাতে কীভাবে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত, ২৪ বছরের শোষণের পর ছিবড়ার মতো ফেলে যাওয়া একটি দেশকে পুনর্গঠন করেছিলেন, এসব আলোচনা হয় না। সরকারি প্রচারযন্ত্রে শুধু তাঁর স্বাধীনতার ডাকের কথা শুনি, কিন্তু তাঁর দেশ গড়ার মহান কীর্তির বিবরণ বর্তমান প্রজন্মকে শোনানো হয় না। অনেকেই শেখ মুজিবকে দেবতা বানানোর প্রচারণায় লিপ্ত, মানুষ শেখ মুজিবকে তাঁরা সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা—এই সত্যটুকু শুধু প্রতিষ্ঠা করছি। একটি দেশের জন্মদাতা শুধু নন, শক্ত জমিনের ওপর এ দেশের ভিত্তি তিনি কীভাবে গড়ে তুলেছিলেন, সেই সত্যটুকু আজও অজানা রয়ে গেছে। এ ধরনের কোনো প্রচেষ্টাও লেখক, গবেষক ও তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা কখনো করেননি। শেখ মুজিবকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি, শুধু স্মৃতি জাদুঘর হয়েছে, মৃত্যুদিবসে শুধু স্মরণসভা ও কাঙালিভোজ হয়, একটি গবেষণাগার হলো না, জাদুঘর হয়েছে।

তবে এ পর্যন্ত একটিমাত্র বই আমি পেয়েছি, যাতে প্রশাসক শেখ মুজিবের মূল্যায়ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বইটির নাম *বাংলাদেশ : ইরা অব শেখ মুজিবুর রহমান*। *বাংলায় বাংলাদেশে শেখ মুজিব যুগ*। লেখক মওদুদ আহমদ, রাজনীতিবিদ, গ্রন্থকার ও গবেষণাভিত্তিক লেখক। প্রায় ২০ বছর আগে প্রকাশিত এবং ইতিমধ্যে এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ হলেও বইটি নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয়নি। লেখকের নাম মওদুদ আহমদ দেখে অনেকে ভ্রু কুঞ্চিত করবেন; কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে বইটি তথ্যবহুল ও অনেকাংশে যুক্তিনির্ভর। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা শুধু নয়, তাঁর কতিপয় তথাকথিত ও বিচ্ছিন্ন বিকৃত আকারে প্রচারিত ব্যর্থতার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সত্যিকার পটভূমির চিত্র

তুলে ধরার পাশাপাশি যে রক্ষীবাহিনী নিয়ে এত সমালোচনা, সেই বাহিনী কেন ও কোন পরিস্থিতিতে গড়ে তোলা হয়েছিল, তারও ব্যাখ্যা ইতি ও নেতিবাচকভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, উদ্দেশ্য ও বাস্তবের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোথায় গরমিল রয়েছে। প্রশাসনিক শূন্যতার কথা আছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তথ্য রয়েছে, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে পদে পদে কোথায় বাধা ছিল, বিত্তের অভাব কতটা ও কী পরিমাণে ছিল, আছে তার বিবরণও। অনেক জানা তথ্য ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য মওদুদের বইয়ের সাহায্য নিয়েছি বলেই তা উল্লেখ করেছি। প্রথমেই সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা যেতে পারে, কী পর্বতপ্রমাণ সমস্যা নিয়ে বঙ্গবন্ধু নতুন দেশের পরিচালনায় হাল ধরেছিলেন, সে সম্পর্কে।

সাধারণভাবে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর সামনে যেসব সমস্যা প্রশ্নের আকারে দেখা দিয়েছিল, সেগুলো হচ্ছে :

১. একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক উচ্চপদগুলোয় ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী। তাঁদের অধিকাংশই অবাঙালি। ইয়াহিয়া শাসনের শেষের দিকের মাত্র চার-পাঁচজন বাঙালি সিএসপি অফিসারকে কেন্দ্রে সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রণালয়ে গুটিকয়েক বাঙালি সচিবও নিম্নতর পর্যায়ে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। একটি রাষ্ট্রের পরিচালনায় গুরুতর দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা ছিল মাত্র অল্প কয়েকজনের। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা, এমনকি প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, অর্থ ও বৈদেশিক দপ্তর পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমলার অভাব ছিল। বঙ্গবন্ধু প্রায়ই বলতেন, একটি প্রাদেশিক রাজ্য বা উপনিবেশ চালানোর অভিজ্ঞতা আছে, এমন লোকজন নিয়ে তাঁকে একটি পূর্ণাঙ্গ দেশ চালাতে হচ্ছে।

২. আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়নের গুরুদায়িত্ব পালন ছিল অতি সুকঠিন। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার আর সমাজবিরোধী ব্যক্তির হাতে হাতে অস্ত্র। অন্যদিকে পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্য সুসংবদ্ধ নেই, তাঁদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। যাঁরা রয়ে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানি শাসকদের অধীনে চাকরি করতে বাধ্য হওয়ার কারণে তাঁরা মানসিক হীনম্মন্যতায় ভুগছিলেন। তার পরও সমাজবিরোধীদের তুলনায় তাঁদের

সংখ্যা ছিল নগণ্য। এই পুলিশ বাহিনী সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা জরুরি হয়ে পড়েছিল। এতে সময় নিয়েছে বলেই আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল।

৩. এক কোটি শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছিল, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ছিল পর্বতপ্রমাণ একটি সমস্যা। যেখানে ভারতের মতো একটি বিশাল দেশ এদের দুমুঠো আহারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, সেখানে এদের পুনর্বাসন-সমস্যা সামাল দিতে গিয়ে নিঃস্ব একটি সরকারের কী সমস্যা হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে হাজার হাজার বসতবাড়ি, যার ফলে আরও এক কোটি মানুষ দেশে থেকেও হয়ে ছিল গৃহহারা।

৪. রেলপথ ওপড়ানো, সমস্ত বগি ভাঙা, নয়তো দুমড়েমুচড়ে আছে। রাস্তাঘাট নেই, দেশের প্রায় সব কটি সেতু যুদ্ধের সময় হয় মুক্তিবাহিনী, না হয় পাকিস্তানি সেনারা ধ্বংস করেছে। ফলে নদীমাতৃক দেশে যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যাহত হতে বাধ্য। কোথা থেকে আসবে এসব পুনর্নির্মাণের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা, অথবা অস্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ফেরি বা পন্টুন সেতু?

৫. মুক্তিযুদ্ধের কারণে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই সীমানা মুছে গিয়েছিল, চোরাচালানির সুযোগ অবাধ হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে সেই সীমান্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে?

৬. ভারতীয় সেনাদের বাংলাদেশে অবস্থান একটি নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কীভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে মিত্রবাহিনীকে ফেরত পাঠানো যাবে, সেটাও ছিল একটা বড় প্রশ্ন বা সমস্যা। এদের অবস্থানের কারণে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে দেশে-বিদেশে নানা অপপ্রচার হতেই পারে।

৭. একদিকে কয়েক লাখ বিহারি, অন্যদিকে পাকিস্তানে আটকে পড়া কয়েক লাখ বাঙালি, এদের নিয়ে কী করা যাবে? উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এদের নিরাপত্তা নিয়েও ছিল দুশ্চিন্তা। এই জটিল সমস্যার সমাধানও ছিল এ কঠিন কর্তব্যেরই অংশ।

৮. স্বজনহারা বেকার মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন-সমস্যা, তাদের নিয়ে কী করা হবে, তা নিয়েও ছিল দুর্ভাবনা।

৯. আরেকটি অস্বাভাবিক সমস্যা ছিল পাকিস্তানিদের হাতে লাঞ্ছিতা নারীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা অথবা তাদের মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসন।

অনেক সময় তাঁর কাছে থাকার কারণে আমরা বুঝেছিলাম, এবংবিধ সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধুকে এককভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এ জন্য তাঁকে বঙ্গবন্ধুর খোলস ছেড়ে কঠোর শাসকের লেবাসটি পরতে গিয়ে মনোবেদনা অনুভব করতে হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনেক সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেও পরে সঠিক অবস্থান থেকে তাঁকে সরে আসতে হয়েছে। যেমন, প্রশাসনিক কার্যক্রমে পাকিস্তানি আমলের আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের বলয় থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্গবন্ধু প্রশাসনের উচ্চপদে আমলাগোষ্ঠীর বাইরে থেকে কতিপয় নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ে ইঞ্জিনিয়ার মঈনুল ইসলাম, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ডা. টি হোসেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত সচিব পদে বাহাউদ্দিন চৌধুরীকে নিয়োগ প্রদান করেও তাঁদের সেখানে রাখতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনিক কার্যক্রমের যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা তৎকালীন আমলাদের ভূমিকা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন না।

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল বছর খানেক আগে থেকেই। অনভিজ্ঞ খাদ্যমন্ত্রী ফণী মজুমদারের ব্যর্থতা কতটুকু ছিল, তা কেউ বুঝতে পারেননি, আর তাঁর বিপরীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পদে আসীন আমলার কার্যক্রম কী ছিল? উল্লেখ্য, চুয়াত্তরের এই আমলার বোধ হয় কোনো দায়দায়িত্ব ছিল না। অথবা অজানা কারণে তিনি তা পূরণ করেননি বলেই পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান তাই তাঁকেই খাদ্যমন্ত্রী পদে সমাসীন করেছিলেন। কারও কারও মতে, বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচি সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ করেছিল আমলাদের। জেলায় জেলায় তাঁদের ওপর খবরদারি করার জন্য রাজনৈতিক গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। কালক্রমে তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে উচ্চপদে যাঁদের বসিয়েছিলেন, তাঁদের সরিয়ে দিয়ে আমলাতন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ফলে গণতান্ত্রিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও প্রশাসনে আমলারা পুনর্বাসিত হলো, একাত্তরে যাদের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

প্রশাসনিক বাধা-বিপত্তির বহু চড়াই-উতরাই পার হতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। তবে অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে সামাল দিয়েছিলেন, তার যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের জন্য একটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ভৌত কাঠামো তৈরি করতে হয়েছে শূন্য হাতে। ইরানের কাছ থেকে ভিক্ষে করে তেল আনতে হয়েছে, গম আর চাল এনেছেন ধার করে। মওদুদ আহমদ তাঁর বইতে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস ও পটভূমি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'এমনিতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল খাদ্যঘাটতিপূর্ণ এলাকা। তার পরও '৭১-এর ডামাডোল আর '৭২-এর কৃষি অবকাঠামো পুনর্গঠনে সময়ক্ষেপণের কারণে খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। একটি অনভিজ্ঞ সরকারের এমন একটি কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা ও লোকবল ছিল না।' মওদুদ এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কথা লেখেননি। কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের অপরাধে, জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণের কারণেই যে বাংলাদেশকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মার্কিন গমের জাহাজ সময়মতো পাঠানো হয়নি, এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কাহিনি সবারই জানা আছে। এই গম চুয়াত্তরে ১০ লাখ নরনারীর জীবন বাঁচাতে পারত।

বিগত শতাব্দীর চুয়াত্তরের মধ্যপ্রাচ্যে তেলসংকট অনেক দেশের মতো বাংলাদেশকেও বিপাকে ফেলেছিল। বিশ্ব অর্থনীতিতে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ধাক্কা সামাল দেওয়া কি সদ্য ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসা একটি দেশ, তার সরকার ও সরকারপ্রধান শেখ মুজিবের জন্য সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল? তবু তা সামলে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, কিন্তু কীভাবে, তা কেউ ভেবে দেখেননি। রাস্তাঘাট, পুল তৈরি করতে হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরের মুখ মুক্তিযোদ্ধাদের ডোবানো জাহাজে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিদেশি সাহায্যে কর্ণফুলী মোহনা পরিষ্কার করতে হয়েছে। অনেক দেশ আর সাহায্য সংস্থাকে সাধ্যসাধনা করে বিমান আর সমুদ্রগামী জাহাজ কিনতে হয়েছে, রেলপথ আর জলপথের যোগাযোগব্যবস্থা সুগম করতে হয়েছে বিদেশি প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। মোদ্দা কথা, একটি সদ্য বিবাহিত দম্পতির নতুন সংসার শুরু করার মতো একটি নতুন রাষ্ট্রের সরকারকে সবকিছু

সাজাতে হয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে, তহবিলে একটি পয়সাও ছিল না। যদিও বিদেশি সাহায্য আর ঋণের এমন অবাধ প্রবাহ ছিল না, তবু বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার প্রভাব খাটিয়ে চুয়াত্তরে সাহায্যদাতা দেশগুলোর কনসোর্টিয়াম গঠন করিয়েছিলেন। আজও আমরা সেই কনসোর্টিয়ামের সুযোগ গ্রহণ করছি। তিনি বিদেশি সাহায্যে পাইপলাইন তৈরি করেছিলেন বলেই পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান বড় গলায় বলতে পেরেছিলেন, 'মানি ইজ নো প্রবলেম।' বঙ্গবন্ধুর আড়াই বছরের প্রশাসনের সমালোচনায় দুর্ভিক্ষ, রক্ষীবাহিনী ও দুর্নীতির বিষয় বারবার উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা, পাকিস্তানি দালালদের ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার বিষয় খুব কমই উল্লেখিত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের আড়াই বছরের বাংলাদেশ সম্পর্কে শেষ কথাটি আবার মওদুদ আহমদের বই থেকেই উদ্ধৃত করতে হচ্ছে। কারণ, অল্প কথায় অনেক কিছু বলা হয়েছে বইটির সমাপ্তিতে। যেমন, 'শেখ মুজিবের সংস্কারমূলক কর্মসূচিসমূহ, তাঁর সকল প্রশাসনিক সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা করার পরও একটা সত্য ভাস্বর হয়ে থাকবে যে, তিনি পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে একটি জাতিকে চিরদিনের জন্য গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেছিলেন। পাকিস্তানি কারাগারে নিহত হলে তিনি হয়তো শহীদ হয়ে অবিস্মরণীয় হতেন, কিন্তু বাংলাদেশে ঘটত চরম অরাজকতা ও হানাহানি। খণ্ড-বিখণ্ডিত হতো দেশটি। এ সত্যটিও মনে রাখতে হবে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনেক জনপ্রিয় নেতাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেননি। শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়েছে, তিনি দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়ে সেই স্বাধীনতাকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। অন্য কারও পক্ষে এই দুরূহ কাজটি করা সম্ভব হতো না। তিনি দেশে ফিরে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু একটি মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ রেখে গেছেন।' বাংলাদেশের প্রথম আড়াই বছরে দেশের ও জনগণের জন্য প্রশাসক শেখ মুজিবের এ হচ্ছে সবচেয়ে বড় অবদান।

‘দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার’ রক্তাক্ত ১৫ আগস্ট

বইটির খোঁজ দিয়েছিলেন *প্রথম আলোর* অনুজ সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বইটি পেলাম রাজিউল হাসান রঞ্জুর কাছে। রঞ্জু আমার একজন স্নেহাস্পদ, একাত্তরে লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন, পরবর্তী সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কূটনীতিকের চাকরি করেছেন। এখন অবসর নিয়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় শুধু নয়, বঙ্গবন্ধু হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে যদি কেউ উদ্যোগ নেন, বইটি তাঁকে পড়তে হবে। বইটির নাম *দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার*। লিখেছেন ক্রিস্টোফার হিচেনস। প্রকাশক আমেরিকার ‘ভার্সো’। একবাক্যে হিচেনসের বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য হলো, ‘কিসিঞ্জার একজন বদমায়েশ, দুষ্কৃতকারী ও একজন খুনি’—‘এ রৌগ, এ ক্রিক অ্যান্ড এ মার্ডারার’। হিচেনস বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা কীভাবে অনেক দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদদের হত্যা ও অপসারণে ষড়যন্ত্র করেছে। বলা বাহুল্য, হিচেনসের বইয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা সম্পর্কেও বলা হয়েছে, রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নেপথ্য ভূমিকার উল্লেখ, সর্বোপরি কিসিঞ্জারের অপকর্মের বিবরণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা।

বঙ্গবন্ধু হত্যারহস্যের উদ্‌ঘাটন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে বলার জন্যই বইটির উল্লেখ করলাম। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের

রায়ের পর লিখেছিলাম, 'খুনের বিচার হয়েছে, হত্যার বিচার হয়নি'। শেখ মুজিবুর রহমান নামক একজন সাধারণ নাগরিককে খুন করার জন্য কয়েকজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে কিন্তু একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, একটি জাতির পিতা, একজন রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যার বিচার হয়নি। ইংরেজি 'মার্ডার' আর 'অ্যাসাসিনেশন', 'কালপেবেল হোমিসাইড', বাংলায় হঠাৎ মাথা গরম করে খুন করা আর পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, এক কথা বোঝায় না। বিগত পঁচাত্তর-পরবর্তী বছরগুলোতে খুনিদের বিচার এবং ফাঁসির রায় কার্যকর করার নিম্ন বা উচ্চ স্বরের দাবি উঠেছে। সেই দাবির আংশিক পূরণ হয়েছে, চরম দণ্ডটি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু জাতির জনকের, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের হত্যার কারণটি, ব্যাপক আদ্যোপান্ত ষড়যন্ত্রটি কখনো পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কি?

প্রায়ই বলা হয়েছে, 'কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্য' তাঁকে খুন করেছেন। বলা হয়নি তাঁরা নিজেরা কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে এই জঘন্য অপরাধ করেছেন অথবা করানো হয়েছে। তাঁরা কি ভাড়াটে বা লেলিয়ে দেওয়া নিয়োগপ্রাপ্ত হত্যাকারী? তারা কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কার্যকর করেছে কি না, সে রহস্য বা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আজও জানা যায়নি। রহস্যজনক কারণে এসব জানার উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। বেশ কয়েক বছর আগে আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শোন ম্যাকব্রাইডের নেতৃত্বে একটি কমিশন লন্ডনস্থ বঙ্গবন্ধু-প্রেমিকদের উদ্যোগে বাংলাদেশে আসার প্রস্তুতি নিয়েছিল। যত দূর মনে পড়ে, ১৯৮২ বা ১৯৮৩ সালে কমিশনের সদস্যদের এরশাদ সরকার ভিসা দেয়নি। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কমিশনটি বা বিলেতে অবস্থানকারী বাঙালি উদ্যোক্তারা এ নিয়ে আর এগোননি। বোধ হয়, বঙ্গবন্ধু খুনের মামলার সূচনার কারণে তদন্তের বিষয়টি চাপা পড়ে গিয়েছিল।

পনেরোই আগস্ট নিছক একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যা নিয়ে আজও কোনো ব্যাপক অনুসন্ধানী তৎপরতা দেখা যায়নি। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে লি হার্ভে অসওয়াল্ড হত্যা করেছিল, তাঁকে গুলি করে মেরেছিল জ্যাক রুবি। সেই খুনের বিচার হয়েছে,

সংশ্লিষ্ট হত্যাকারীর ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু সেখানেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি, কেনেডি হত্যা তদন্ত থেমে থাকেনি। একটি চলমান প্রক্রিয়ায় ষড়যন্ত্রকারীদের সন্ধান আজও চলছে; জাস্টিস ওয়ারেনের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন হয়েছে। বইয়ের পর বই লিখেছেন আগ্রহী, কৌতূহলী ও সত্যানুসন্ধানী লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা। সেসব বইয়ে জানতে ও জানাতে চেষ্টা করা হয়েছে, 'হু কিল্ড কেনেডি অ্যান্ড হোয়াই?' তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় নাকি, যে মেরেছে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার পরও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, 'কেনেডিকে আসলে কে নয়, কারা মেরেছে?' সহজ-সরল প্রশ্নটি হচ্ছে, খুন কারা করেছে না হয় জানা গেল, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী তথা হুকুমের আসামি কারা, যারা প্রকৃতই হত্যার জন্য দায়ী, তারা অন্ধকারেই থেকে গেল।

বঙ্গবন্ধু হত্যার আলোচনায় বিচ্ছিন্নভাবে, এমনকি রাজনৈতিক বিতর্ক ও পারস্পরিক দোষারোপকালে নানা ধরনের কথাবার্তা হয়েছে। অনেক নাম আলোচিত হয়েছে, তবে সবই ভাসা-ভাসা ও অসংলগ্নভাবে।

রাজনৈতিক বিতর্ক অথবা দোষারোপের সময় কিংবা 'অফ-হ্যান্ড রিমার্ক' করতে গিয়ে অথবা কোনো জনসভায় বা বিবৃতি প্রদানকালে আকস্মিকভাবে অনেক নাম উচ্চারিত হয়েছে, যা কখনো সামনে আসেনি, তা হচ্ছে 'ষড়যন্ত্র'। এর মূলে বোধ হয় 'বিদেশি সংশ্লিষ্টতা' নিয়ে কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। তাই আজ বঙ্গবন্ধু হত্যায় বৈদেশিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিকেই সামনে নিয়ে আসতে চাই। বিশেষ করে, ক্রিস্টোফার হিচেনসের বইয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যায় আমেরিকার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার, গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, এমনকি পেন্টাগনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে শুধু বাংলাদেশ নয়, আরও অনেক দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদকে হত্যার কাহিনিরও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এসব হত্যাকাণ্ড আর রাষ্ট্রনায়ক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতাচ্যুতিতে অনেক ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের চাণক্য কিসিঞ্জারের নাম এসেছে। অন্য সব বাদ দিয়ে চিলির আয়েন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাহিনিটির উল্লেখ করছি। হিচেনস বলেছেন, 'আয়েন্দকে নির্মূল করার জন্য তারা তাঁর যে সেনাধ্যক্ষকে ঘুষ দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেই

জেনারেল রেনে শেনিডার ক্যু করতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে খুন করা হয়।' এমনিভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক সাইপ্রাসের ম্যাকারিওসকে হত্যা, ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতাচ্যুত করায় কিসিঞ্জারের ভূমিকা ছিল বলে পরে জানা গেছে। ঘানার নক্রুমা, কঙ্গোর লুমুম্বা, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণসহ অনেকের হত্যা ও ক্ষমতাচ্যুতিকে শুধু সেই সব দেশের 'কতিপয় ব্যক্তির ক্ষমতালিপ্সা' অথবা 'উচ্চাভিলাষী বা বিপথগামী সৈনিকের' হঠকারী কাজ বলে মনে করা হয় না। একই প্রেক্ষাপটে হিচেনস চিলির আয়েন্দের ভাগ্যবিড়ম্বনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হত্যায় বাইরের ষড়যন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন। এসব নিয়ে পশ্চিমা দুনিয়ায় গবেষণা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতার বিষয় নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমরা নিজেরা অন্ধকারে রয়ে গেছি।

বঙ্গবন্ধু হত্যায় কতিপয় বিদেশি শক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হলেই স্বাভাবিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের নাম সামনে আসবেই। চীন, এমনকি দিল্লির সাউথ ব্লকের কোনো মহলের ভূমিকা নিয়েও কেউ কেউ নানা প্রশ্ন তোলেন। একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন, নভেম্বরে বঙ্গভবন থেকে বিতাড়িত হয়ে হত্যাকারীরা অন্য কোনো দেশ নয়, লিবিয়ায় এমন সহজে আশ্রয় পেল কেন? এই হত্যাষড়যন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়েই কি এমন একটি ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল? যোগাযোগটি কার মাধ্যমে ঘটেছিল, তা নিয়ে কেউ ভেবেছেন কি না, আজও জানা যায়নি। ক্রিস্টোফারের অনেক আগে লিফত্‌শুলজ বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন মহলের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে লেখালেখি করেছেন। সর্বপ্রথম *আনফিনিশড রেভল্যুশন* বইটিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেনানী কর্নেল তাহেরের ফাঁসি ও বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কাহিনি বর্ণনা করেছেন। *ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার* বইটিতে পুরো একটি অধ্যায় রয়েছে, যার শিরোনাম 'বাংলাদেশ, ওয়ান জেনোসাইড, ওয়ান ক্যু অ্যান্ড ওয়ান অ্যাসাসিনেশন'। এতে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যা পর্যন্ত নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। *দ্য আনফিনিশড রেভল্যুশন*-এর লেখক লিফত্‌শুলজ ছাড়াও একাত্তরের বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান কনসাল আর্চার ব্লাডের *দ্য ব্রুটাল বার্থ অব বাংলাদেশ* বই থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ১৯৭৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের উচ্চপর্যায়ে, এমনকি রাষ্ট্রদূত বোস্টারের সঙ্গে পর্যন্ত যোগাযোগ করেছে। পরবর্তীকালে উইকিলিকসে উদ্ধৃত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে (এটিও একটি রহস্যজনক ব্যাপার) কিসিঞ্জার যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখনই মার্কিন দূতাবাসে একটি রহস্যজনক বৈঠক হয়েছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল, 'মুজিব-হত্যা'। যা-ই হোক, লিফত্‌শুল্‌জ জানাচ্ছেন, কংগ্রেসম্যান সোলার্জ স্টেট ডিপার্টমেন্টকে চিঠি দেওয়ার পর জবাব পেয়েছিলেন। লিফত্‌শুলজকে সোলার্জ জানিয়েছেন, 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট এসব বৈঠকের খবর স্বীকার বা অস্বীকার করছে না।' আবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের চিঠিতে বলা হয়েছে, 'স্টেট ডিপার্টমেন্টে সাবেক সিআইএ-প্রধানের সাক্ষ্য থেকে আরও যে বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে, তা হলো, এই বৈঠকের ব্যাপারে (মুজিবুর) রহমানকে অবহিত করা হয়েছিল। সম্ভাব্য ক্যু সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করা হয়েছিল (*ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার*, পৃ. ৫৩-৫৪)। হিচেনসের বইতে কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফরের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, 'উইদিন আ ফিউ উইকস অব হিজ ডিপারচার আ ফ্যাকশান ইন দি ইউএস অ্যাম্বাসি ইন ঢাকা বিগেন কভার্টলি মিটিং উইথ আ গ্রুপ অব বাংলাদেশি অফিসার্স হু ওয়্যার প্ল্যানিং আ ক্যু অ্যাগেইনস্ট মুজিব (ঐ, পৃ. ৫০-৫১)।' হিচেনসের ভাষ্য অনুযায়ী মনে হচ্ছে, কিসিঞ্জার ঢাকা থাকাকালেই আমেরিকান দূতাবাসে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল অথবা তার বীজ বপন করা হয়েছিল। কিসিঞ্জারের প্রস্থানের পরপরই ছক কাটার ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়।

অন্য আর কোনো দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে কি হত্যাকারীদের যোগাযোগ হয়েছিল? ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট আমি একপ্রকার গোপনে লন্ডন চলে যাই। সেখানে *সানডে টাইমস*-এ খণ্ডকালীন চাকরি করি। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আগে উল্লেখ করা রাজিউল হাসান ও সুইডেনে আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আবদুর রাজ্জাক, যিনি হত্যার প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেছিলেন, সুইডিশ সরকারের আমন্ত্রণে আমাকে সেখানে নিয়ে যান। সেখানে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইউরো শাখার

তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট, পরে প্রেসিডেন্ট *ল্যা এক্সপ্রেসেন* পত্রিকার সিনিয়র এডিটর টমাস হ্যামবার্গের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন রঞ্জু। তাঁর সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানোর ব্যাপারে আমার কয়েক দফা বৈঠক হয়েছিল। টমাস আমাকে বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ষড়যন্ত্রের অগ্রিম আভাস অন্য বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের কূটনীতিকেরা পেয়েছিলেন। তাঁর জানা মতে, আরও অনেক দেশের কূটনীতিকের সঙ্গে হত্যাকারীরা কথা পর্যন্ত বলেছিল। ক্যু ব্যর্থ হলে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আশ্বাস চেয়েছিলেন। যেসব দেশ আলোচনায় আসে, তার মধ্যে এক নম্বরে ছিল পাকিস্তান। ১৯৯১ সালে আমি ইংরেজি পত্রিকা *নিউজ ডে*র সম্পাদনার দায়িত্ব পালনকালে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলাম। করাচিতে পুরোনো বন্ধু—পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক—মিনহাজ বার্নারের সঙ্গে অনেক কথার ফাঁকে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গও আলোচনায় এসেছিল। বার্নারের ভাই মিরাজ মোহাম্মদ ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর একান্ত সচিব এবং পাকিস্তানের ট্রেড ইউনিয়নের একজন নেতা। বার্নার জানালেন, ১৫ আগস্ট ভোর ছয়টায় (আমাদের সময় সাতটা) ভুট্টো উল্লসিত কণ্ঠে মিরাজকে বঙ্গবন্ধু হত্যার খবরটি টেলিফোনে দিয়েছিলেন। মিনহাজ বার্নার ও আমি দুজনই আলোচনা করছিলাম, সেদিন এত ভোরে ভুট্টো এমন একটি সংবাদ পেলেন কী করে? মনে হয় স্বাভাবিক কূটনৈতিক চ্যানেলে ঢাকাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে থেকেই তাঁকে খবরটি পাঠানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যা নিয়ে এসব ছোটখাটো বিষয়ও গুরুত্ব পেতে পারে।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কৌসুলি বঙ্গবন্ধুর অন্তরঙ্গ সখা অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের ছেলে স্নেহভাজন আনিসুল হক নিজেও আগে-পরে মামলা পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিএনপি সরকার তাঁকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তাঁকে একদিন টেলিফোন করে বললাম, 'হত্যা মামলার বিচারের সময় কখনো মামলার শুনানিতে বিদেশি কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তির নামের উল্লেখ করেছিলেন কি না? না করলে করেননি কেন? শুনানির বিবরণ পত্রিকায় পড়ে মনে হচ্ছে, বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করেছিলাম, কেন এ

বিষয়টি সামনে এল না। আনিস সরাসরি কিছু বলতে চায়নি, এখনো বলে না। তবে বুঝেছিলাম, বিদেশি দুটি রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক বিচারকাজকে বিলম্বিত করত। এমনিতেই আমেরিকায় অবস্থানরত তিন আসামিকে সে দেশ থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে ওয়াশিংটন নানা অজুহাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন তোলা হলে বিদেশি রাষ্ট্র, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হয়ে যেত। হয়তো আরও অনেক দেশ এবং রাষ্ট্রপ্রধানের নামও এসে যেত, যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য বিব্রতকর, বৈদেশিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর হতে পারত। তবে আনিস জানালেন, একপর্যায়ে ফারুকের কৌসুলি খান সাইফুর একটি 'থার্ড ফোর্স' বা 'তৃতীয় শক্তি'র জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু উল্লেখ পর্যন্তই, এ নিয়ে কোনো আলোচনা আর সামনে এগোয়নি। তখন এগোয়নি কেন, সেটা স্পষ্ট। কিন্তু এখন নতুন করে গবেষণা হতে বাধা কোথায়? প্রশ্নটি কাকে করব?